আবহাওয়া ও আমরা

অপরাজিত বসু

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

আবহাওয়া ও আমরা

অপরাজিত বসু, এম. এসসি., পিএইচ. ডি.
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ABAHAOWA O AMARA
[Weather and Man]
By Aparajito Basu

প্রকাশকাল :
ডিসেম্বর, ১৯৮৬

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যান্‌সন্‌, (নবম তল)
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

চিত্রাঙ্কন : কমল শেঠ
প্রচ্ছদ : বিমল দাস ও প্রদীপ সাহা

মূল্য : দশ টাকা

Published by Dr. Ladlimohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resources Development (Department of Education), New Delhi.

নিবেদন

আমাদের জীবনে আবহাওয়ার এবং জলবায়ুর মূল্য কতখানি তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই। পরপর দু' বছর অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দেশের অর্থনীতিকে কোথায় টেনে নিয়ে যায় তার সাক্ষ্য ইতিহাসে অনেক আছে। বছর আটেক আগেকার পশ্চিমবঙ্গের বন্যা, ষাটের দশকের মাঝামাঝি বিহারের খরা—এখনো আমাদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। তাছাড়া, সাইক্লোন, কালবৈশাখীর তাণ্ডবের কথা মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে দেখতে পাই। তবে, এই হ'ল ধ্বংসের দিক। রুটিন মাফিক আবহাওয়া মানুষের সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। সময়মতো বৃষ্টি, তুষারপাত, রৌদ্র পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করেছে।

আবহাওয়ার প্রভাব আমাদের মনের উপরই বা কম কি? পরিচ্ছন্ন রৌদ্রজ্জ্বল দিনে, মৃদু-মন্দ বাতাসে আমাদের প্রাণে খুশীর জোয়ার বয়। আবার প্যাচপ্যাচে গরম, কিংবা একঘেয়ে বৃষ্টি অসহ্য হয়ে ওঠে। সাহেবদের দেশে তো প্রথম আলাপে আবহাওয়ার কথা ওঠে। ইদানীং আমরাও আবহাওয়া-সচেতন হয়েছি। সকালের খবরের কাগজে বা রেডিওতে আবহাওয়ার সংবাদ দেখা ও শোনা অনেকের স্বভাব। আজকাল বায়ুদূষণ, ধোঁয়াশা, অসময়ে বৃষ্টি—এসব ব্যাপারে অনেকেই আলোচনা করেন।

শুধু কি আবহাওয়া, বাতাস নিয়েও আমাদের কত ভাবনা। রেডিও তরঙ্গের সঠিক প্রতিফলন, মেরু অঞ্চলের অরোরা আলো, সূর্যের চৌম্বক ঝড়ের সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পর্ক—ইত্যাদি কত বিষয়ের সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছি।

এর পাশাপাশি আর একটা জিনিস দেখছি, সাধারণের উপযোগী আবহাওয়া নিয়ে লেখা তেমন বই বাংলায় চোখে পড়ছে না। সেই অভাব কিছুটা পূরণের জন্য 'আবহাওয়া ও আমরা' বইটি লেখা হয়েছে। লোকপ্রিয় বিজ্ঞান বাংলায় কিছু কিছু লেখা হলেও আমরা বিশ্বাস করি এখনো সঠিক মানে পৌঁছাতে আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে। সেই দীর্ঘ পদযাত্রায়

এই ক্ষুদ্র পদক্ষেপ, এই ক্ষুদ্র সংযোজন। পাঠকের কিছুমাত্র কৌতূহল যদি এই বই মেটাতে পারে তাহলে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

অপরাজিত বসু

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬

কলকাতা

সূচীপত্র

আবহাওয়া ও আমরা

এই পৃথিবী এই বাতাস

আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা শুরু করার গোড়াতেই একটা প্রশ্ন আমাদের মনে আসে ঃ পৃথিবীর বহির্ভাগে কি চিরকাল বাতাস ছিল ? আজকের মতো চিরদিনই কি সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল নিয়ে পৃথিবীর দিন কেটেছে ? এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সৃষ্টির গোড়ায় যেতে হবে। পৃথিবীর জন্মকথা নিয়ে বিজ্ঞানীরা কি বলেন ?

গ্রহ উপগ্রহ সূর্যের উৎপত্তি নিয়ে নানা রকমের মতবাদ চালু আছে। সর্বাধুনিক যে বক্তব্যটি বিজ্ঞানীসমাজ মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েছেন, তার প্রবক্তা হলেন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল ফন ভাইজস্থাকার। মহাকাশের আন্তর্নাক্ষত্রিক প্রদেশে প্রচুর পরিমাণ ধুলো ও মহাজাগতিক গ্যাস আছে। নীহারিকার মধ্যে ধুলো গ্যাসের মেঘ নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে আবর্তন করে চলেছে। ধুলিকণাগুলির পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণের টানে এবং আলোর চাপে তারা একসঙ্গে জড়ো হতে থাকে এবং ক্রমশ ভারী ও বৃহদাকার বস্তু-পিণ্ডের রূপ নেয়। যতই বস্তু এক জায়গায় মিলতে থাকে ততোই ওজনের চাপে পিণ্ডের কেন্দ্রে উত্তাপ ঊর্ধ্বমুখী হয়। ক্রমবর্ধমান উত্তাপ এক সময় তাপপারমাণবিক বিক্রিয়া শুরু করে—বস্তুপিণ্ড জন্ম দেয় নক্ষত্রের। নক্ষত্র গড়ে ওঠার এই তত্ত্ব যে শুধুই কল্পনা নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে অরিওন (Orion) নীহারিকার মধ্যে। সাত বছরের নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা অরিওন মেঘের নক্ষত্রে পরিবর্তনের রূপরেখা চোখে দেখতে পেয়েছেন।

আমাদের সূর্য ঠিক এমনি একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র। সূর্যও যথারীতি পারিপার্শ্বিক গ্যাস ও ধুলোর মেঘের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল। কালে আবর্তন চক্রগুলি সূর্যের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে মাধ্যাকর্ষণের ফলে এক জায়গায় ঘন হতে হতে শেষে গ্রহের জন্ম দিল। গ্রহর চারদিকে ভাসমান মেঘধূলি অনুরূপভাবে জন্ম দিল উপগ্রহের।

মহাজাগতিক গ্যাসের মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ ছড়ানো থাকে, এর সিংহভাগ দখল করে আছে একা হাইড্রোজেন। ধুলো থেকে মাঝারি

আকারের একটা গ্রহ উৎপত্তি হতে সময় লাগে কম বেশি দশ কোটি বছর। তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির সাহায্যে ভূবিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন যে আজ হতে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে আমাদের বসুন্ধরা জন্মলাভ করেছিল।

পৃথিবীর এই সাড়ে চারশ কোটি বছরের ইতিহাস ভীষণ রকম নাটকীয়। রঙ্গমঞ্চে কুশীলবরা এসেছে, নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেছে এবং যবনিকা শেষে নতুন পটভূমিতে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে মহাজাগতিক বস্তুখণ্ডগুলির সম্পর্ক কত নিবিড় তা বোঝা যায় মৌলিক পদার্থ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। নীহারিকা, নক্ষত্র, উল্কাখণ্ড—এমনকি ঘূর্ণায়মান মহাকাশীয় মেঘের মধ্যে নানান মৌলিক পদার্থ শতকরা যতটা পরিমাণে আছে, বিস্ময়করভাবে পৃথিবীতে তারা ঠিক ততটাই আছে! সিদ্ধান্ত স্পষ্ট: মহাকাশ থেকেই বিবর্তনের পথ ধরে পৃথিবীর আগমন।

এখন, একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে মৌলিক পদার্থগুলির পারমাণবিক ভার যত বেড়েছে মহাকাশে ততো তাদের দাবী কমেছে, অর্থাৎ শতকরা পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। কেবল একটা ব্যতিক্রম—হিসাব মতো মহাকাশে যত লোহা থাকা উচিত, বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, তার থেকে বেশি আছে। ইংরাজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল এর একটি সুচারু ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কি সেই ব্যাখ্যা? নক্ষত্রগুলির জন্ম হয়েছে হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে। তাপ-পারমাণবিক বিক্রিয়ার পথে হাইড্রোজেন থেকে অন্য মৌলিক পদার্থগুলি জন্ম নেয়। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন থেকে উৎপত্তি হয় হিলিয়ামের। এভাবে বহু কোটি বছর অতিক্রান্ত হবার পর, হিলিয়াম থেকে জন্ম নেয় কার্বন, তারপর অক্সিজেন, নিওন, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, সালফার ইত্যাদি। ইতিমধ্যে তাপপারমাণবিক ক্রিয়া কমে আসার দরুন নক্ষত্র তার স্থিতি হারিয়ে ফেলে এবং এক সময় নিদারুণ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। প্রাচীন নক্ষত্র বিদীর্ণ হয়ে জন্ম নেয় 'সুপারনোভা' নক্ষত্র। সত্যসত্যই ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে স্বচক্ষে এমন একটি অতি উজ্জ্বল সুপারনোভা দেখেছিলেন। অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলিক পদার্থ নিয়ে ভেঙে খান খান হয়ে পড়া প্রাচীন নক্ষত্র মহাকাশের হাইড্রোজেন মেঘে আবার ছড়িয়ে পড়ে। হাইড্রোজেন মেঘ আবার ঐ নক্ষত্র-টুকরো আঁকড়ে ধরে জন্ম দেয় নতুন নক্ষত্রের। স্বভাবতই নতুন নক্ষত্রের কেন্দ্র পুরানো নক্ষত্র দিয়ে গঠিত বলে তাতে ভারী মৌলিক পদার্থ বেশি থাকে।

তারপর? নক্ষত্রের পর নক্ষত্র জন্ম নেয়, এক সময় সাম্যাবস্থা হারিয়ে ভেঙে পড়ে, আবার ভাঙা অংশকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় নতুন নক্ষত্র। আমাদের সূর্যকে তৃতীয় প্রজন্মের নক্ষত্র বলা হয়। তার প্রমাণ, সূর্যে ভারী মৌলিক পদার্থগুলি পরিমাণে মহাকাশে ছড়ানো ঐ পদার্থগুলি থেকে চারগুণ বেশি।

ফ্রেড হয়েল গণনা করে দেখিয়েছেন যে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় উষ্ণতা যখন ৩৩০ কোটি ডিগ্রী কেলভিন পৌছায়, তখন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের গঠন-ক্রিয়ার বেগ দ্রুত বেড়ে যায়। হয়েলের গণনা মতে, এই অবস্থায় লোহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ৫০ থেকে ৬০-এর অন্তর্বর্তী পারমাণবিক ভার সম্পন্ন মৌলগুলি (লোহার পারমাণবিক ভার—৫৬) গঠিত হবার সময় নক্ষত্রে বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের জন্য নক্ষত্র-টুকরোগুলি দ্রুত শীতল হয়ে পরবর্তী তাপপারমাণবিক ক্রিয়া বন্ধ করে একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি করে। ফলে, লোহা এবং তার প্রায় সমান ওজনের মৌলগুলির আনুপাতিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। লোহার পারমাণবিক ভারের কাছাকাছি পারমাণবিক ভার কোবাল্ট, নিকেলের। লোহা, কোবাল্ট, নিকেল যে মহাকাশে অনেক ছড়ানো আছে তার প্রমাণ উল্কা। উল্কার প্রধান উপাদান লোহা, নিকেল। পৃথিবীর কেন্দ্র আজও লোহা, নিকেলের বন্ধনে আবদ্ধ। অন্যান্য গ্রহগুলির কেন্দ্রভাগে যে লৌহসমৃদ্ধ শিলার প্রাধান্য সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত। ঘূর্ণায়মান লোহা-নিকেল পৃথিবীর চৌম্বকত্বের জন্য দায়ী—একথাও অনেকে মনে করেন।

বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হল যে আদি পৃথিবীর কেন্দ্রভাগে লোহা নিকেলের চারপাশে অন্যান্য পদার্থ জড়ো হয়ে হয়ে বস্তুপিণ্ডের জন্ম হয়েছিল। মাধ্যাকর্ষণের টানে পদার্থপিণ্ড সংকুচিত হতে হতে সংকীর্ণ স্থানে বন্দী হয়ে কেন্দ্রভাগকে উত্তপ্ত করে তোলে। তাছাড়া তেজস্ক্রিয়তার কারণেও ভূগোলকের অন্তর্ভাগ ভালোভাবেই গরম হয়ে থাকে। এসবের জন্য বস্তুকণার মধ্যে আবদ্ধ গ্যাস ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসে আদি ও অকৃত্রিম বায়ুমণ্ডলের জন্ম দিয়েছিল।

শর্ত—এক দুই তিন

কোন গ্রহে আদৌ বায়ুমণ্ডল থাকবে কি না, বা থাকলেও কি অবস্থায়

থাকবে তা বেশ কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে নাইট্রোজেন অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল আছে, চাঁদে নেই। চাঁদের পিঠ ন্যাড়া, ছিঁটে-ফোঁটা গ্যাসের হদিশ নেই। আবার শুক্রগ্রহের আকাশ ছেয়ে আছে ঘন কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মেঘে। মঙ্গলে আছে একদম পাতলা কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্তর, পৃথিবীর তুলনায় সে প্রায় কিছুই নয়। অতিকায় বৃহস্পতি বা শনির বেশির ভাগই তো গ্যাস দিয়ে তৈরি। সেদেশে হাইড্রোজেনের পুরু স্তরের নিচে কোথায় কোন্ তলায় হয়তো পাথুরে জমি আছে।

কোন গ্যাস কোন একটি গ্রহ বা উপগ্রহের পিঠে লেগে থাকবে কি না তা নির্ভর করে—প্রথমত গ্যাসটির রাসায়নিক সক্রিয়তা, দ্বিতীয়ত গ্রহ বা উপগ্রহর ভর, তৃতীয়ত গ্যাসের আণবিক ভার এবং চতুর্থত গ্যাসের উষ্ণতার উপর। রাসায়নিক দিক থেকে সক্রিয় গ্যাসের পক্ষে দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে থাকা সম্ভব নয়। যেমন অক্সিজেন। অক্সিজেন সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলকে 'অস্থায়ী বায়ুমণ্ডল' বলে। কারণ, অক্সিজেন সব সময় পাথর, কয়লা, হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টায় আছে। যদি না অন্য কোনভাবে বাতাসে অক্সিজেন সরবরাহের সুযোগ থাকে তাহলে অক্সিজেন কমে কমে শেষে একদিন শূন্যের কোঠায় পৌছাবে।

এরপর গ্রহর ভর কিভাবে গ্যাস ধরে রাখার ব্যাপারে কাজ করে তা বলি। ধরা যাক, পৃথিবী থেকে এক টুকরো পাথর আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। পাথরটা কিছুটা উপরে উঠে ফিরে আসবে। পাথরের গতিবেগ যদি বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দেয়া যেত তাহলে পাথরটা পৃথিবীতে না ফিরে উপ-গ্রহর মতো পৃথিবী পরিক্রমা করতো। এরপর যদি কেউ উপগ্রহ বানাবার গতিবেগ থেকে আরো বেশি গতিবেগ দিয়ে পাথর ছোঁড়ে তাহলে দেখবো সে পাথর পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে সুদূর মহাকাশের পথে পাড়ি জমিয়েছে। শেষোক্ত গতিবেগের নাম 'মুক্তিবেগ'। মুক্তিবেগ গ্রহর ভর ও ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে বস্তুর মুক্তিবেগ ঃ এক সেকেণ্ডে প্রায় সাত মাইল। চাঁদ বা মঙ্গলের বস্তুদের মুক্তিবেগ পৃথিবীর থেকে কম, আবার বৃহস্পতিতে মুক্তিবেগ বেশি।

গ্যাসের আণবিক ভর এবং উষ্ণতার উপর কিভাবে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে এবার তা দেখি। গ্যাসের গতিতত্ত্বে আমরা জানতে পেরেছি যে অণুর গতিবেগ গ্যাসের আণবিক ভার এবং উষ্ণতার উপর নির্ভর করে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে গ্যাসের আণবিক ভার বাড়লে অণুর গতিবেগ কমে যায়। অর্থাৎ ভারী অণু ধীরে সুস্থে চলে। গ্যাসের উষ্ণতা বাড়তে গ্যাসীয় অণুর গতিবেগ বাড়ে। তার মানে, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এসব হালকা পরমাণুগুলি একটু বেশি উষ্ণতায় এমন গতিবেগ লাভ করে যে তা হামেশাই মুক্তিবেগের থেকে বেশি হয়ে যায়। পৃথিবীর বাতাসে আজ যে আমরা হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম গ্যাস পাই না, তার কারণ একটাই— হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতায় এত জোরে ছোটে যে তা মুক্তিবেগের থেকে বেশি। অত্যধিক গতি নিয়ে তারা মহাকাশে মহাপ্রস্থানের পথ ধরে। কিন্তু অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন বা কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণুগুলি এত ভারী যে তাদের গতিবেগ মোটেই মুক্তিবেগের ধারে কাছে আসতে পারে না। সেজন্য পৃথিবীর মায়া কাটানো তাদের পক্ষে অসম্ভব।

পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সমুদ্রের এক নিবিড় যোগাযোগ আছে, এ যেন এক আত্মিক সম্পর্ক। সমুদ্র গড়ে ওঠার পিছনে যে সর্তগুলি কাজ করে তা বুঝে নেওয়া যাক। সমুদ্রের জল একটি তরল পদার্থ, বোধ হয় একমাত্র আমাদের পৃথিবীতেই তরল জলের সমুদ্র আছে। সৌরজগতের আর একটি জায়গায়, শনির উপগ্রহ টাইটানে তরল মিথেনের সমুদ্র আছে বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কোন গ্রহর উষ্ণতা খুব কম হলে সব কিছু জমে গিয়ে কঠিন হয়ে যাবে, অনড় অচল কঠিন। আবার গ্রহর উষ্ণতা যদি খুব বেশি হয় তাহলে সব কিছু বাষ্পের চেহারা নেবে। তাহলে এটা বলা যায় যে খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরমের গ্রহ-উপগ্রহতে তরল পদার্থ দিয়ে ভরা সমুদ্র থাকতে পারে না। উষ্ণতা কম হলেই যে তরল পদার্থের সমুদ্র পাওয়া যাবে, তাও নয়। যদি কোন গ্রহর বায়ুমণ্ডল পাতলা হয় (যেমন মঙ্গলগ্রহ) তাহলে সেখানে বাতাসের চাপও কম হবে। কম বাতাসের চাপে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায়ও তরল বাষ্পীভূত হয়। মঙ্গলের উষ্ণতা বেশি নয় ; তাহলেও সেখানে তরল জল থাকা অসম্ভব। কারণ অস্বাভাবিক নিচু বায়ুচাপে সে জল মুহূর্তে বাষ্প হয়ে যাবে।

সূর্যই যে কোন গ্রহর মূল তাপ ভাণ্ডার। প্রতিদিন সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের রৌদ্র, আলো ও তাপের ধারায় স্নান করায়। গ্রহর পেটের মধ্যে যে নিয়ত ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকেও গ্রহ কিছু তাপ সংগ্রহ করে।

সূর্য যে তাপ গ্রহর দিকে পাঠায় তার অনেকটা আবার মহাকাশে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। গাছপালা মাটি পাথর থেকে বরফ, জল বেশি আলো প্রতিফলন করে। বহুদূর থেকে একটি গ্রহকে কতটা চক্‌চকে আর উজ্জ্বল দেখাবে তা ঐ আলো প্রতিফলনের উপর নির্ভর করে।

গ্রহগুলি সূর্য থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে সব আলো পায়, তার একটা বড় অংশই গ্রহ ফিরিয়ে দেয়। গ্রহর মাটি পাথরের ফিরিয়ে দেওয়া আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মাপের দিকে বড় হয়, এর নাম অবলোহিত রশ্মি। জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা বড় গুণ তারা অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে পারে। তার মানে, সূর্যের কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বা অতিবেগুনী রশ্মিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্প গ্রহর মাটিতে আসতে দিলেও ফিরে যাওয়া অবলোহিত রশ্মিকে তারা শোষণ করে নেয়। এভাবে গ্রহর উত্তাপ বন্দী হয়ে মাটিকে গরম করে তোলে। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা 'গ্রীণ হাউস এফেক্ট' বলেন। শীতের দেশে বা ঠাণ্ডা পাহাড়ের মাথায় উদ্ভিদ বাগানে গরম দেশের গাছপালা বাঁচাতে একটি কাচের ঘরে তাদের পরিচর্যা করা হয়। এই কাচের ঘরের নাম 'গ্রীণ হাউস'। সূর্য কাচের ছাদ দিয়ে সব রকম আলো ভিতরে ঢালে, কিন্তু ভিতরের অবলোহিত রশ্মিকে কাচ আটকে রাখে, বেরোতে দেয় না। কাচের ঘরের উষ্ণতা যায় বেড়ে। কৃত্রিম আবহাওয়ায় গরম দেশের গাছ দিব্যি বেঁচে থাকে।

তাহলে আমরা বুঝলাম যে কোন কারণে বাতাসে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যায় তাহলে গ্রহর উষ্ণতা যাবে বেড়ে। ঠিক এমনটি ঘটেছে শুক্রগ্রহে। শুক্রের ঘন কার্বন ডাইঅক্সাইড মেঘ সেখানকার উষ্ণতাকে ৪০০° সেন্টিগ্রেডের উপরে তুলে দিয়ে গেছে। নানা কারণে আমাদের বায়ুমণ্ডলেও কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে, উষ্ণতা বাড়ছে, আসছে অনেক বিপত্তি।

প্রতিবেশীদের কথা

সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ। বুধ গ্রহ খুবই ছোট ও হালকা, ওজনে বুধ পৃথিবীর পঁচিশ ভাগের একভাগ মাত্র। সেজন্য বুধের অভিকর্ষজ বল বেশ কম। আর কম বলেই বুধ তার আকাশে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড বেঁধে রাখতে পারেনি। বুধে মুক্তিবেগ কম, সহজেই

গ্যাসীয় অণুগুলির গতিবেগ তাকে অতিক্রম করে যায়। ফলে যা হবার তাই—বুধ গ্রহে বায়ুমণ্ডল বলে কিছু নেই। ঠিক একই কারণে, অর্থাৎ দুর্বল অভিকর্ষজ বলের জন্য চাঁদের আকাশেও বাতাস নেই।

বুধের পরের গ্রহ শুক্র। শুক্রে একটি ঘন বাতাবরণ আছে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে রুশ কবি ও বিজ্ঞানী লোমোনোসভ শুক্রের বায়ুমণ্ডল আবিষ্কার করেছিলেন। শুক্র আর পৃথিবীকে যমজ বোন বলা হয়, কারণ আকারে ব্যবহারে এদের মধ্যে ভীষণ মিল। শুক্রের বাতাসে শতকরা ৯৩-৯৭ ভাগ কার্বন-ডাইঅক্সাইড, ২-৩ ভাগের মতো নাইট্রোজেন, একভাগের মতো জলীয় বাষ্প এবং ছিঁটেফোঁটা অক্সিজেন আছে। বেশি কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকার জন্য শুক্রগ্রহে 'গ্রীণ হাউস এফেক্ট' খুব সক্রিয়। শুক্রের মাটিতে বাতাসের চাপও বেশি, পৃথিবীর তুলনায় প্রায় একশ গুণ। শুক্র সূর্যের কাছাকাছি বলে এমনিতেই সেখানে পৃথিবীর থেকে ৮° বেশি উষ্ণতা আছে। অত্যধিক উষ্ণতা শুক্রের জলীয় বাষ্পকে জমিয়ে তরল জল করতে বাধা দিয়েছে। যেহেতু একমাত্র জলই বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত করে পাললিক শিলাস্তরে বন্দী করার ক্ষমতা রাখে, তাই জলের অভাবে শুক্রের কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাতাস থেকে অপসারিত হতে পারলো না। শুক্রগ্রহে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মেঘ এত ঘন যে বাইরে থেকে শুক্রের মাটি চোখে পড়ে না। যেজন্য শুক্র কোন্‌দিকে পাক দিচ্ছে তা অনেকদিন জানা ছিল না।

পৃথিবীর কাছাকাছি আর একটি গ্রহ মঙ্গল। মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর থেকে বেশ ছোট বলে তার অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের তিন ভাগের একভাগ মাত্র। কম অভিকর্ষের জন্য হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি হালকা গ্যাস-গুলি বাতাসে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তাই মঙ্গলের বাতাস বেশ পাতলা, পৃথিবীতে ত্রিশ হাজার মিটার উঁচুতে বাতাস যতটা হালকা মঙ্গলের মাটির উপরের বাতাস ঠিক ততটা লঘু, ফুরফুরে! মঙ্গলের প্রায় না থাকা বাতাসেও কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রধান উপাদান বলে জানা গেছে। অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্প—সে প্রায় না থাকারই মতো। শীতকালে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলে জমাট কার্বন-ডাইঅক্সাইডের শুভ্র স্তর দেখা যায়। মঙ্গলগ্রহর গড় উষ্ণতা মাত্র বিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। কেউ কেউ বলেন যে অতীতে মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর মতো একটি বায়ুমণ্ডল ছিল। ক্রমে বাতাসের সব অক্সিজেনকে মাটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেঁধে ফেলে। মঙ্গলের

মাটি বোঝাই হয়ে আছে লাল রঙের ফেরিক অক্সাইডে। সেজন্য পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহকে রক্তরাঙা গ্রহ মনে হয়।

মঙ্গলগ্রহর পরই আসছে গ্রহরাজ বৃহস্পতি। বৃহস্পতি আমাদের পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ১৩০০ গুণ বড় হলেও তুলনামূলকভাবে হালকা। এর জন্য দায়ী হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস। বৃহস্পতির আকাশে হাইড্রোজেনের আধিক্য বেশি, এর সঙ্গে রয়েছে হিলিয়াম, অ্যামোনিয়া, মিথেন। অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন একেবারেই নেই। বৃহস্পতির আবহাওয়ামণ্ডল খুব পুরু, প্রায় ১২০০০ কিলোমিটার পুরু। তাই বৃহস্পতির মাটিতে বাতাসের চাপ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দশ লক্ষগুণ বেশি।

সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহর নাম শনি। ঠিক বৃহস্পতির মতো শনিগ্রহেও একটি ঘন বাতাবরণ আছে, যার মূল উপাদান হাইড্রোজেন। তাছাড়া মিথেন, হিলিয়াম, অ্যামোনিয়া গ্যাসের খোঁজ পাওয়া গেছে। শনির উপগ্রহে টাইটানে তরল মিথেনের সাগর আছে বলে অনেকে অনুমান করেন। চাঁদের মুক্তিবেগ আর টাইটানের মুক্তিবেগে খুব একটা পার্থক্য নেই, তবু যে টাইটানে একটি গভীর বাতাবরণ আছে তার কারণ টাইটানের নিম্ন উষ্ণতা। সূর্য থেকে লম্বা দূরত্বে থাকার দরুন টাইটান ভীষণ রকম ঠাণ্ডা, শীতলতাই বেঁধে রাখছে গ্যাসের আবরণকে।

ইউরেনাস, নেপচুনও গ্যাসীয় উপাদানে পূর্ণ। সৌরজগতের শেষ গ্রহ প্লুটোর ধরনটা একেবারে আলাদা। প্লুটোতে কোন বাতাসের হদিশ মেলেনি।

বিবর্তনের পথে

এবার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল নিয়ে আলোচনায় আসি। পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর। আমাদের বায়ুমণ্ডলটিও পৃথিবীর প্রায় সমবয়সী। ভূপদার্থবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের বায়ুমণ্ডল তিনটি ধাপে পরিবর্তিত হয়ে আজকের রূপ নিয়েছে। আদি পৃথিবীর বাইরের দিকটায় লোহার প্রাচুর্য ছিল। আকাশে ছিল ঘন হাইড্রোজেনের মেঘ।

লোহা ও হাইড্রোজেন বিজারক পদার্থ, কিন্তু আধুনিক বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন আছে বলে তা জারক প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে

বিজারক প্রকৃতি থেকে জারক প্রকৃতিতে রূপান্তর—এই হল বায়ুমণ্ডলের বিবর্তনের ধারা। একদিন দু'দিনে নয়, পরিবর্তন হয়েছে চারশ কোটি বছর ধরে।

আদি পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল বলতে হাইড্রোজেন মণ্ডলকে বোঝায়। হাইড্রোজেনের সঙ্গে আরো কিছু মৌলিক পদার্থ, যেমন হিলিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক সঙ্গী ছিল। হাইড্রোজেন একটি সক্রিয় পদার্থ বলে তা কার্বনের সঙ্গে দ্রুত যুক্ত হয়ে মিথেন গ্যাস, অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে জলীয় বাষ্প, গন্ধকের সঙ্গে মিলে হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রোজেনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন করলো। তবে সেই পুরাতন হাইড্রোজেনের অল্পই এখনো পৃথিবীতে পড়ে আছে, প্রতি পঞ্চাশ লক্ষ আদি হাইড্রোজেন পরমাণুর মাত্র একটি এখনো আটক আছে। কিছুটা হাইড্রোজেন থেকে গেলেও আদি হিলিয়ামের কোন অংশই পৃথিবীতে বাধা পড়েনি। কারণ পরিষ্কার। হিলিয়াম হালকা গ্যাস, কিন্তু রাসায়নিক দিক থেকে খুব নিষ্ক্রিয়, কারোর সঙ্গে যুক্ত হয় না। মুক্ত হিলিয়ামের পক্ষে বেশিদিন পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব হল না, মহাকাশে তার মহানিষ্ক্রমণ হল। আজও যে বাতাসে ছিঁটেফোঁটা হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যায়, তা কিন্তু সেই আদি হিলিয়াম নয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে হিলিয়াম গ্যাস জন্মায়—তারই এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ তলানি হিসাবে পড়ে আছে।

মহাবিশ্বে কার্বনের পরিমাণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফারের তুলনায় বেশি; সেজন্য প্রাগৈতিহাসিক বায়ুমণ্ডলে মিথেনের অংশভাগ জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইডের থেকে অনেক বেশি ছিল। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত, আদি বাতাসের প্রধান উপাদান—হাইড্রোজেন ও মিথেন এবং অপ্রধান উপাদান জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন ও আর্গন। লক্ষ্য করার ব্যাপার, সে সময় বাতাসে একেবারেই মুক্ত অক্সিজেন ছিল না। অর্থাৎ জীবন বিকাশের প্রয়োজনীয় শর্তের ঘাটতি ছিল যথেষ্ট।

এই অবস্থাটা চলে দীর্ঘদিন—প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে। পৃথিবীর জন্মকাল থেকে যতদিন না পর্যন্ত আরো আরো মহাজাগতিক ধুলোর চাপে এবং ক্রমবর্ধমান অভিকর্ষের টানে লোহার উপরিস্তর কেন্দ্রভাগে না চলে

যায়, ততদিন এই বায়ুমণ্ডলই বজায় ছিল। লোহার উপরিস্তর পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর পৃথিবীর চেহারাটা প্রায় এখনকার মতো দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে আগ্নেয়গিরি থেকে যে গ্যাস বের হতে থাকলো, জলীয় বাষ্পই ছিল তাতে প্রধান। তাছাড়া কার্বন-মনোঅক্সাইড, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন, সালফার-ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেনও অল্প পরিমাণে ছিল। আগ্নেয়গিরির গ্যাস বায়ুমণ্ডলের বিজারক ধর্মকে কিছুটা কমিয়ে আনে। আদি বায়ুমণ্ডলের যে হাইড্রোজেন রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে রইলো, তা বাদ দিয়ে বাকি মুক্ত হাইড্রোজেন আস্তে আস্তে মহাকাশে বিলীন হয়ে হাইড্রোজেনমুক্ত বাতাসের জন্ম দিল।

ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন, আদিতে পৃথিবীতে সমুদ্র বলে কিছু ছিল না, তার বদলে বাতাসে ঘন জলীয় বাষ্পময় মেঘের প্রাচুর্য ছিল। পৃথিবী শীতল হতে শুরু করলে বৃষ্টি নামলো, বৃষ্টি চললো দিনের পর দিন—মাসের পর মাস। পৃথিবী ভরে উঠলো জলে—জন্ম নিল নদী, সাগর, মহাসাগর। শুরু হল বায়ুমণ্ডলের বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়।

উর্ধ্বকাশ থেকে আগত নানান রশ্মি, বিশেষত অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে জলীয় বাষ্প বিযোজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করা শুরু করে দিল। উৎপাদিত হাইড্রোজেন মহাকাশে বিলীন হল এবং অক্সিজেন পৃথিবীর ভূত্বক ও আবহাওয়াকে জারিত করার কাজে নেমে পড়লো। অর্থাৎ, উৎপাদিত অক্সিজেন খরচ হবার বেশ একটা রাস্তা দেখা দিল। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের একশ' পঞ্চাশ কোটি বছর, অক্সিজেন উৎপাদিত হলেও তা বাতাসে জমতে পারলো না। মিথেন গ্যাস জারিত হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রোজেন উৎপাদিত হলো।

আমরা আগেই বলেছি যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস লম্বা দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে পারে বলে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মধ্য দিয়ে গ্রহর তাপ মহাকাশে পালাতে পারে না। পৃথিবীর বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড জমলো তা শুক্র গ্রহের মতো বেশি নয়, আবার মঙ্গলের মতো কমও নয়,—তাই পৃথিবীর উষ্ণতা একটা মাঝামাঝি জায়গায় এসে দাঁড়ালো। উষ্ণতার প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রাণের বিকাশপর্বে একটা মাঝারি উষ্ণতাই প্রয়োজন।

বিবর্তনের তৃতীয় পর্যায় শুরু বাতাসে উদ্বৃত্ত অক্সিজেনের মধ্য দিয়ে। এই সময় যে হারে অক্সিজেন উৎপাদিত হচ্ছিল তার থেকে কম হারে খরচ হচ্ছিল। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাসে আস্তে আস্তে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়তে লাগলো। নাইট্রোজেন গ্যাস খুব একটা সক্রিয় নয়—তাই বাতাসের নাইট্রোজেন প্রায় অটুট রইলো। কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলের সঙ্গে মিশে কার্বনিক অ্যাসিড হল। এই কার্বনিক অ্যাসিড কোন কোন অক্সাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বোনেট পাথরের স্তূপ তৈরি করলো—জন্ম নিল চুনাপাথর।

রূপান্তরিত শিলার মধ্যে কার্বন যৌগগুলি আটক রয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন যে বাতাসে বর্তমানে যতখানি কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে তার পঞ্চাশগুণ পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড সমুদ্রের জলে এবং এক হাজার গুণ পরিমাণ রূপান্তরিত শিলায় ধরে রাখা আছে। সমুদ্রের জল বাতাসের কঠিন কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিয়ন্ত্রিত করে জীবনবিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনা করে দিল।

এদিকে উদ্বৃত্ত অক্সিজেন ক্রমে ওজোন গ্যাসে রূপান্তর শুরু করলো। ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে। অতিবেগুনী রশ্মি যে কোন জীবিত কোষের পক্ষে মারাত্মক। আমাদের মাথার উপরের একটি পুরু ওজোন স্তর এইভাবে আমাদের রক্ষা করে চলেছে। ওজোনের ছত্রছায়ায়, মাঝারি উষ্ণতায়, জলীয় পটভূমিতে প্রথম প্রাণের বিকাশ হল। জন্ম নিল সরল উদ্ভিদ, ব্লু গ্রীণ অলগি ইত্যাদি। নবজাত উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষের পথে বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড টেনে অক্সিজেন মুক্ত করা আরম্ভ করলো, বাতাসে অক্সিজেনের আনুপাতিক পরিমাণ আরো বেড়ে গেল। প্রচুর অক্সিজেন জীবন বিকাশের রাস্তাকে প্রশস্ততর করে উন্নত জীবনের জন্ম দিল। এই সেই সময় যাকে আমরা বায়ুমণ্ডলের বিকাশের তৃতীয় স্তর বলি। বাতাসে অক্সিজেন বাড়তে বাড়তে শেষ প্রত্নতাত্ত্বিক যুগে (ষাট কোটি বছর আগে) এত অক্সিজেন হল যে বহুকোষী প্রাণী জন্ম নেয়ার সুযোগ হল। রূপে রসে বৈচিত্র্যে আমাদের পৃথিবী সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একই রকম আছে।

	সময়কাল	প্রধান অংশ	অপ্রধান অংশ
প্রথম স্তর	জন্ম থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর	মিথেন, হাই-ড্রোজেন	জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া, আরগন
দ্বিতীয় স্তর	পঞ্চাশ কোটি বছর থেকে দু'শ কোটি বছর	নাইট্রোজেন	জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আরগন
তৃতীয় স্তর	দু'শ কোটি বছর থেকে বর্তমান কাল	নাইট্রোজেন, অক্সিজেন	আরগন, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড

বিগত সাড়ে চারশ কোটি বছরের পৃথিবীর ইতিহাস খুবই রোমাঞ্চকর সন্দেহ নেই। সেই অতীত কাল থেকে বাতাসে কত রকমের গ্যাস যুক্ত হয়েছে, কত গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে বেরিয়ে গেছে। কি এলো আর কি গেলো তার একটা হিসাব যদি করা যায় তাহলে বিবর্তনের মূল ধারাটি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আমাদের একটা ধারণা হবে। যে সব গ্যাস বিভিন্ন সময়ে বাতাসে যুক্ত হয়েছে, তারা হল—আগ্নেয়গিরি ও মহাজাগতিক ধুলোর মধ্যেকার আবদ্ধ গ্যাস, জলীয় বাষ্প থেকে অক্সিজেন, সালোক সংশ্লেষের পথে অক্সিজেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে হিলিয়াম, তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম থেকে আর্গন গ্যাস। যে সব গ্যাস বাতাস থেকে বিদায় নিয়েছে, তারা হল—হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের মিলনের মধ্য দিয়ে উভয়ের অপসারণ, কয়লা-পেট্রোলিয়াম, চুনাপাথর, প্রাণীদেহ গঠনের জন্য কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অপসারণ, নাইট্রো-জেনের অক্সাইড তৈরি করার কাজে অক্সিজেন খরচ এবং মহাকাশে হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের মহানিষ্ক্রমণ।

বায়ুমণ্ডল আমাদের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ কাজে বায়ুমণ্ডলের কোন্ উপাদানের কি কাজ তা বোঝা প্রয়োজন। এরপর আমরা সেই আলোচনায় আসছি।

বাতাসের উপাদান

গ্রহ-গ্রহান্তরের বাতাসের কথা আগে আলোচিত হয়েছে, এবার ঘরের কাছের বাতাসের কথায় আসা যাক। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে বিশ্বাসী। গোটা ভূগোলককে ঘিরে আছে বায়ুর বাতাবরণ, পৃথিবীর জমির শতকরা পঁচাত্তর ভাগ দখল করেছে লবণাক্ত জলরাশি। সমুদ্রের জল ও গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডলে খুব ভাবসাব, নিবিড় সম্পর্ক।

কোন তরল পদার্থ তার স্ফুটনাংকর থেকে কম উষ্ণতায়ও ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়। সূর্যের প্রখর কিরণে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে, বাতাসের জলীয় বাষ্প বৃষ্টি হয়ে আবার সমুদ্রে ফিরে আসে। অবশ্য কিছুটা জলীয় বাষ্প বরফ হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বা মেরু অঞ্চলে দীর্ঘকালের জন্য আটকও থাকে। জলীয় বাষ্প, বাতাস, জল, বৃষ্টি, বরফ—সব নিয়ে যে সুবৃহৎ চক্র—তা সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

আজ যেমন আমরা বাতাসের প্রত্যেকটা অংশের ভূমিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, কয়েকশ' বছর আগে কিন্তু তা ছিল না, আমরা বাতাস সম্পর্কে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিলাম। প্রাচীনকালে ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ, ব্যোমের মধ্যে মরুৎ বা বাতাসকে অন্যতম মৌলিক পদার্থ বলে মনে করা হত। বাতাস যে আদৌ মৌলিক পদার্থ নয়, অনেকগুলি গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র—তা জানতে অনেক অনেকদিন সময় লেগেছিল। অ্যালকেমিষ্টদের যুগে বাতাসের সঙ্গে অন্য যে কোন গ্যাসের পার্থক্য করা হত না, মনে করা হত—ওরা সব একই জিনিস। পদার্থবিদরাই গ্যাস নিয়ে মাথা ঘামাতেন, গ্যাসের চাপ আয়তন উষ্ণতা মাপতেন। সেদিনের বিজ্ঞানের উষালগ্নে গ্যাস সম্পর্কে অন্যতম প্রধান সূত্র—'বয়েলের সূত্র' আবিষ্কৃত হয়েছিল। রসায়নবিদের কাছে গ্যাস-বাতাস সব একই অর্থ ছিল। ফলের রস থেকে ইউরোপীয়রা দীর্ঘকাল মদ বানাতে ওস্তাদ, অ্যালকেমিষ্টরা বলতেন—'রস গেঁজিয়ে অ্যালকোহল ও বাতাস বের হচ্ছে'। এখন আমরা জানি, ফলের রস গেঁজিয়ে যে ফেনার পাহাড় মাথা চাড়া দেয় তার মূলে আছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস। কার্বনডাইঅক্সাইড আর বাতাস যে এক জিনিস

নয়, তা কিন্তু তখনকার রসায়নবিদরা মোটেই জানতেন না। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের রসায়নবিদ জোসেফ ব্ল্যাক কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে খুব জোরের সঙ্গে বলেন যে এই গ্যাস আর বাতাস এক জিনিস নয়। বাতাসে যে অল্প কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে তাও তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

প্রাথমিক রসায়ন

মাত্র দু'শ বছর আগেও রসায়নবিজ্ঞান ছিল নিতান্তই দুর্বল। মানুষ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় 'দহনের' সঙ্গে পরিচিত ছিল। অঙ্গার, গন্ধক, ধাতু ইত্যাদি বাতাসে পুড়ে নিঃশেষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রসায়নবিজ্ঞানীদের মধ্যে এক অদ্ভুত দহন তত্ত্ব (Phlogistic theory) প্রচলিত ছিল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যে বস্তু দহনযোগ্য, তার মধ্যে দহন সহায়ক অংশ বা phlogiston আছে বলে মনে করা হত। যেমন, কার্বন বা অঙ্গার দহনযোগ্য, তাই অঙ্গারের সঙ্গে অন্য কোন দহন সহায়ক পদার্থ বা phlogiston আছে। দহন সহায়ক পদার্থ দহনে সাহায্য করে। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য দীর্ঘকাল গ্যাসের স্বরূপ জানা সম্ভব হয়নি।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ বিজ্ঞানী হেনরী কেভেণ্ডিস একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে জোসেফ প্রিস্টলিকে জানালেন যে তিনি একটা নতুন ধরনের 'বাতাস' আবিষ্কার করেছেন। কেভেণ্ডিস তাঁর নতুন পাওয়া গ্যাসের নাম দিলেন 'শ্বাসরোধী বাতাস'। এ বাতাস কোন প্রাণীকে বাঁচার জন্য সাহায্য করে না। কিভাবে কেভেণ্ডিস একে পেয়েছিলেন? প্রথমে সাধারণ বাতাসকে বারে বারে গরম কয়লার উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে ক্ষারে শোধন করা হল—শোধনের পর যা পড়ে রইলো তাই-ই 'শ্বাসরোধী বাতাস'।

কিন্তু কেভেণ্ডিস বেশিদিন তাঁর নয়া বাতাস নিয়ে গবেষণা চালাননি, অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রিস্টলি গবেষণাটা নিয়ে অনেকদূর এগিয়েছিলেন। নানারকম দাহ্য পদার্থ বাতাসে জালিয়ে, ক্ষারের দ্রবণে চালিয়ে প্রিস্টলি 'শ্বাসরোধী বাতাস' তৈরি করেছিলেন। আসলে এই 'শ্বাসরোধী বাতাস' যে নাইট্রোজেন তা প্রিস্টলি জানতেন না। আর

জানবেনই বা কি করে? নাইট্রোজেন যে তখনো 'আবিষ্কারই' হয়নি। 'দহনতত্ত্বের' আচ্ছন্নতায় তাঁরা এই গ্যাসটির বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারেননি। অনেকদিন পর, ১৭৮৭ সালে প্রতিভাবান ফরাসী রসায়নবিদ আন্তোনি ল্যাভোসিয়ে এর 'অ্যাজোট' বা জীবনবিরোধী নাম দেন এবং একে একটি নতুন গ্যাস বলে চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে 'অ্যাজোট' নাম বদলে 'নাইট্রোজেন' নাম দেওয়া হয়।

পরে হেনরী কেভেণ্ডিস নাইট্রোজেনের উপর বিশদ গবেষণা করেছিলেন। 'শ্বাসরোধী বাতাস' যে সাধারণ বাতাসের অংশ—তা-ও তিনি বুঝেছিলেন। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। কেভেণ্ডিস 'শ্বাসরোধী বাতাসের' মৌলিকত্ব নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন। বাতাস থেকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দূর করার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে নাইট্রোজেন বা 'শ্বাসরোধী বাতাসের' একটি ক্ষুদ্র অংশ শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে। এই গ্যাস যে আরগন তা তিনি মোটেই বোঝেননি। একশ' বছর পর আর্গন আবিষ্কৃত হয়েছিল।

বাতাসে অক্সিজেন আবিষ্কার করেছিলেন ফরাসী রসায়নবিদ ল্যাভোসিয়ে। ল্যাভোসিয়ে প্রথমে 'দহনতত্ত্বে' বিশ্বাসী ছিলেন। তখনকার অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, দহনযোগ্য পদার্থের মধ্যেই দহনের সহায়ক আছে। কিন্তু যতই তিনি গবেষণাগারে সময় দিতে লাগলেন ততই তিনি এই তত্ত্বের অসারতা বুঝতে পারলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একাধিক দহনযোগ্য পদার্থকে বাতাসে পুড়িয়ে একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণে এলেন: প্রত্যেকবার দহনের পর দাহ্য পদার্থের ওজন বেড়েছে। কিন্তু 'দহনতত্ত্ব' অনুযায়ী দহনের পর দাহ্য পদার্থের ওজন কমার কথা, কারণ দহন সহায়ক পদার্থ নিঃশেষিত হয়েই তো দহন হয়। পরীক্ষাগুলি শেষ করার পর ল্যাভোসিয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, বাতাসে প্রধানত ত্নটি গ্যাস আছে। একটি অংশ দহনে সাহায্য করে, অন্য অংশ করে না। প্রথমে ল্যাভোসিয়ে ভেবেছিলেন, দহন সহায়ক গ্যাস আর মদ গেঁজানো গ্যাস অভিন্ন। কিছুদিন পর তিনি ভুল বুঝতে পারলেন। ১৭৭৪ সালেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, বাতাসের যে অংশ দহনে সাহায্য করছে তাতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্ভব। এরপর প্রিস্টলির সঙ্গে ল্যাভোসিয়ের যোগাযোগ

হয়। ল্যাভোসিয়ে লাল মারকিউরিক অক্সাইড উত্তপ্ত করে দহন সহায়ক গ্যাস উৎপন্ন করেন—বাতাসের অক্সিজেন আবিষ্কৃত হল।

আসলে ল্যাভোসিয়ে দুটি পরীক্ষা করেছিলেন। প্রথম পরীক্ষাটি ছিল এইরকম—কাচের তৈরি লম্বা গলার একটা বকযন্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণ পারদ নিলেন, লম্বা গলার বাঁকানো প্রান্তটি অন্য একটি পারদ-পাত্রে এমনভাবে রাখলেন যাতে বাঁকানো মুখটি পাত্রের পারদ-তল ছাড়িয়ে কিছুটা উপরে থাকে। এরপর একটি অংশাঙ্কিত বেলজার দিয়ে বকযন্ত্রের মুখ ঢেকে পারদ-পাত্রে উপুড় করে রাখলেন। এভাবে বকযন্ত্রের ভেতরের বাতাসের সঙ্গে কেবলমাত্র বেলজারের ভিতরের বাতাসের যোগ রইলো, বাইরের বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে পারলো না। এরপর দীর্ঘদিন ধরে বকযন্ত্রের পারদ উত্তপ্ত করা হল। দেখা গেল, শেষের দিকে বকযন্ত্রের পারদের চকচকে ভাবটা চলে গিয়ে তার উপর একটা লাল সর পড়েছে, আর ঐ দিকে বেল-জারের মধ্যে পারদের তল কিছুটা উঠে এসেছে। বোঝা গেল, বেলজারের বাতাসের একটা অংশ পারদের সঙ্গে মিশে লাল সর তৈরি হয়েছে আর সেই ফাঁকা জায়গাটা দখল করতে পারদ উঠেছে। মাপা হল, দেখা গেল যে মোট বাতাসের এক-পঞ্চমাংশ পারদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, বাকিটা অবিকৃত আছে। বাতাসের যে এক-পঞ্চমাংশ পারদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যাকে ল্যাভোসিয়ে 'প্রাণবায়ু' বলেছিলেন—তা অক্সিজেন, বাকিটা মূলত নাইট্রোজেন। অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ বাতাস যে জীবন ধারণের উপযোগী নয় তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। নাইট্রোজেন শুধু যে শ্বাসের অনুপযুক্ত, তাই নয়—দহনেও সহায়ক নয়। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তথাকথিত 'দহনতত্ত্ব' পরিত্যক্ত হয়।

এরপর ল্যাভোসিয়ে দ্বিতীয় পরীক্ষা করে তাঁর সিদ্ধান্ত আরো জোরদার করেন। বকযন্ত্রের পারদের উপর যে লাল সরটি পড়েছিল, তা তিনি সযত্নে তুলে একটি টেস্টটিউবে নিলেন। এইবার এই টেস্টটিউবকে খুব জোরে গরম করলেন, তাতে ঐ লাল সর থেকে যে গ্যাস বেরিয়ে এলো তাকে গ্যাসজারে সংগ্রহ করলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে নবলব্ধ গ্যাস জীবন সহায়ক, দহন সহায়ক এবং পূর্ব পরীক্ষায় বাতাসের অন্তর্হিত অংশের সমান। ল্যাভোসিয়ে একে প্রথম পরীক্ষার লুপ্ত গ্যাস বলে দাবী করেন। আজ আমরা জানি যে গ্যাসটি অক্সিজেন ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথম

পরীক্ষাতে পারদ বাতাসের এক-পঞ্চমাংশ বা অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে মারকিউরিক অক্সাইডের লাল সর উৎপন্ন করলো এবং দ্বিতীয় পরীক্ষাতে ঐ লাল সর অধিক উষ্ণতায় ভেঙ্গে গিয়ে পারদ আর অক্সিজেনকে ফিরিয়ে দিল।

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ছাড়া বাতাসে বেশ কিছুটা আরগন গ্যাস আছে। বাতাসে আরগন বা আরগন জাতীয় অন্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস খুঁজে পেতে আরো প্রায় একশ বছর লেগেছিল। এ সবের উপরে আছে জলীয় বাষ্প। বাতাস একটি মিশ্র পদার্থ, তার উপাদানের পরিমাণগুলি সব সময় ঠিক থাকে না। যেমন, বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে, শীতকালে কম। শহর কারখানা অঞ্চলে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড, সালফিউরিক নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন সালফাইডের দেখা মেলে। সমুদ্রতীরের নির্মল বাতাসে বা ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাস দেখা যায়।

বায়ুর উপাদানগুলির আয়তনের শতকরা অনুপাত এইরকম—

নাইট্রোজেন	৭৭·১৬
অক্সিজেন	২০·৬০
জলীয় বাষ্প	১·৪০
কার্বন-ডাইঅক্সাইড	০·০৪
নিষ্ক্রিয় গ্যাস (আরগন, ক্রিপ্টন ইত্যাদি)	০·৮০

আবার, বাতাসের উপাদানগুলির ওজনের শতকরা অনুপাত এইরকম—

নাইট্রোজেন	৭৫·৫
অক্সিজেন	২৩·২
আরগন ও অন্যান্য	১·৩

সমতার দাবী

সাধারণভাবে কতগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা বাতাসের উপাদানগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি। প্রথমেই অক্সিজেনের কথা ধরা যাক। বায়ুমণ্ডলে যে জীবজগৎ বেঁচে থাকতে পারে, তাতেই প্রমাণ হয় বাতাসে অক্সিজেন আছে। আর একটি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

নাইট্রিক অক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস, কিন্তু নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসের রঙ বাদামী। আমরা জানি, নাইট্রিক অক্সাইড অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। এবার কি করা হল, নাইট্রিক অক্সাইড ভর্তি একটি গ্যাস জারের মুখ খুলে দেওয়া হল, এতে বাতাসের সঙ্গে নাইট্রিক অক্সাইড মেশার সুযোগ পাবে। গ্যাস জারের মুখ খুলে দেবার পরমুহূর্তেই বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইডের রঙ বদলে বাদামী হয়ে গেল। এতে প্রমাণ হল যে বাতাসে অক্সিজেন আছে। বাতাসের অক্সিজেন যুক্ত হয়েছে নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে এবং বাদামী বর্ণের নাইট্রো-জেন-ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করেছে।

অনেকদিন ধরেই বাতাসে মোট অক্সিজেনের পরিমাণ স্থির হয়ে আছে। অক্সিজেন একটি সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও মোট অক্সিজেনের অংশ বাড়ছে বা কমছে না কেন? এর কারণ, বাতাসে অক্সিজেনের সমতা আছে। বিভিন্নভাবে বাতাস থেকে যে অক্সিজেন অপসারিত হচ্ছে, অন্য উপায়ে তা আবার পুরনও হচ্ছে। যেমন, প্রাণী উদ্ভিদ প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন শুষছে, দহনের জন্য অক্সিজেনের ব্যায় হচ্ছে, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্ষরণের সময় অক্সিজেন নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিলছে—এভাবে অক্সিজেন খরচ হচ্ছে। আবার উদ্ভিদ, বিশেষত সমুদ্রে ভাসমান প্লাঙ্কটন সালোক-সংশ্লেষ পদ্ধতিতে অক্সিজেন ত্যাগ করছে, অর্থাৎ ঘাটতি অক্সিজেনের পুরন হচ্ছে।

বাতাসে যে নাইট্রোজেন আছে তা আমরা একটি সহজ পরীক্ষা করে বুঝতে পারি। ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর একটা পাতলা পাতকে বাতাসে জালিয়ে দিলে কিছুটা ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড তৈরি হয়। ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইডে জল ঢাললে সুনির্দিষ্ট গন্ধের অ্যামোনিয়া গ্যাস বেরিয়ে আসে। সুপরিচিত গন্ধ দিয়ে আমরা সহজেই অ্যামোনিয়া চিনতে পারি। আমরা এ-ও জানি যে অ্যামোনিয়া এমন একটি যৌগিক পদার্থ যাতে নাইট্রোজেন আছে। অ্যামোনিয়ার নাইট্রোজেন এসেছে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড থেকে, ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড তার নাইট্রোজেন পেয়েছে বাতাস থেকে। তাহলে শেষ পর্যন্ত অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম যে বাতাসে নাইট্রোজেন আছে।

অক্সিজেনের মতো বাতাসে দীর্ঘকাল নাইট্রোজেন নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে আছে। যদিও প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য নাইট্রোজেনের সরাসরি প্রয়োজন নেই, তবু একথা সত্য যে প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে অন্যতম প্রধান মৌলিক পদার্থ—নাইট্রোজেন। জীবদেহে প্রোটিন একটি অতুলনীয় যৌগ। প্রোটিনের প্রধান উপাদানই নাইট্রোজেন। বাতাসে মোট নাইট্রোজেন পরিমাণে ঠিক থাকলেও সে নাইট্রোজেন বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ ক্ষরণের সময় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে, এই নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিলে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বৃষ্টির জলধারার সাথে নাইট্রিক অ্যাসিড মাটিতে নেমে আসে, এবং মাটির ধাতব অক্সাইড বা ক্ষারকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রেট লবণ তৈরি করে। এই নাইট্রেট লবণকে উদ্ভিদ মাটির রসের

নাইট্রোজেন চক্র

সঙ্গে গ্রহণ করে এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের জন্ম দেয়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন প্রাণী গ্রহণ করে প্রাণীজ প্রোটিন গড়ে তোলে। মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ ব্যাক-টেরিয়ার আক্রমণে নষ্ট হয়ে অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেন গ্যাস বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। কোন কোন উদ্ভিদ (মটর, ছোলা) সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণে সমর্থ। এইসব উদ্ভিদের শিকড়ে নডিউল নামে একরকম অঙ্কুর জন্মায়। নডিউলের ব্যাকটেরিয়া প্রত্যক্ষভাবে বাতাসের নাইট্রো-জেনকে যৌগে পরিণত করে। প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ কালক্রমে একদিন ধ্বংস হয়, পচে অ্যামোনিয়া ও অন্য নাইট্রোজেনের যৌগের সৃষ্টি হয়।

অ্যামোনিয়া আবার মূত্র থেকে বের হয়। এই সব নাইট্রোজেন যৌগগুলি নাইট্রোসোফায়িং ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রথমে নাইট্রাইট লবণে, পরে নাইট্রিফায়িং ব্যাকটেরিয়া এদের নাইট্রেট লবণে রূপান্তরিত করে। কিছু ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়াকে জারিত করে বাতাসে নাইট্রোজেন ফিরিয়ে দেয়। অর্থাৎ একটি সামগ্রিক নাইট্রোজেন সমতাচক্র বহুদিন ধরে চলছে।

বাতাসের অন্যতম উপাদান জলীয় বাষ্প। বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতা বাড়ে, শীতে কমে। বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তা একটি সহজ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি। একটা পরিষ্কার শুকনো কাচের গ্লাসে বরফ মেশানো জল কিছুক্ষণ রেখে দিলে দেখা যাবে যে গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটা জমে যাচ্ছে। গ্লাসের গায়ের লাগোয়া বাতাস প্রথমে ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা বাতাসের জলীয় বাষ্প তখন জমে বিন্দু বিন্দু জলকণার আকার নিয়ে গ্লাসের গায়ে লেগে যায়। যত বাতাস শুকনো থাকবে তত কম জলকণা জমবে।

ঋতু পরিবর্তনের জন্য বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়ে কমে। সমুদ্রের কাছাকাছি বাতাসে যতটা আর্দ্রতা থাকে, দেশের অন্তর্ভাগে ততটা নয়। বাতাসের নাইট্রোজেন অক্সিজেন দেশে দেশে পালটায় না, তবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ পরিবর্তনশীল। বাংলার জলবায়ু যতটা আর্দ্র, পাঞ্জাবে ততটা নয়। বাতাসের জলীয় বাষ্পও একটি বৃহৎ 'জলচক্রের' অন্তর্ভুক্ত। যে জল সমুদ্রে থাকে, তাই মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়ে ঝরে, বরফ হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে, মাটির নিচে লুকিয়ে পড়ে, প্রাণী উদ্ভিদের দেহে আশ্রয় নেয়।

বাতাসে যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে তারই বা প্রমাণ কি? এক বাটি পরিষ্কার চুনের জল খোলা হাওয়ায় রেখে দিলে চুনের জলের উপর ধীরে ধীরে একটা সাদা স্তর জমে। এই স্তর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে তৈরি। চুন বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে জুড়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বানায়। এতেই বোঝা গেল, বাতাসে ভালোরকম কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে।

দীর্ঘকাল আগুন জালিয়ে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাড়িয়েছি,

ইদানীং তো খুব বেশি করেই বাড়ছে। তবু যে বাতাসের মোট কার্বন-ডাইঅক্সাইড সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, তার কারণ এখানেও একটা সমতা কাজ করছে।
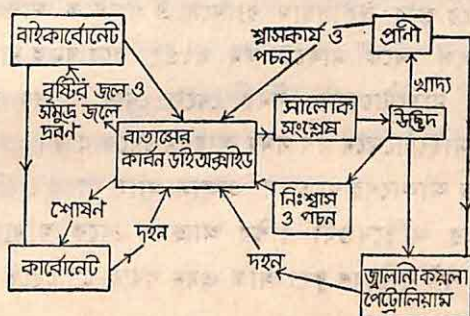
কার্বন-ডাইঅক্সাইড চক্র

বাতাসে গড়পড়তা যতটা কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাড়ে ঠিক ততটা অন্যদিকে খরচও হয়। উদ্ভিদ তার খাদ্য বানাতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে, উদ্ভিদের এই ভূমিকা প্রাণীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আবার, সমুদ্রের জল কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করে, বাইকার্বোনেট লবণ তৈরি করে। কোন কোন ক্ষার সরাসরি কার্বন-ডাইঅক্সাইড টেনে কার্বোনেটের পাহাড় স্তূপ গড়ে তোলে। আবার জ্বালানীর দহন, প্রাণীর নিঃশ্বাস, পচন, বাইকার্বোনেট কার্বোনেট লবণ ভেঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আত্মপ্রকাশ—এভাবে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়।

আজকাল পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়ছে, বাতাসে যে হারে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাড়ছে সে হারে কমছে না—এই অবস্থাটা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চিন্তিত করে তুলেছে।

উপেক্ষিতাদের নিয়ে

নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাদে বাতাসে অল্প করে আরগন, ক্রিপ্টন জেনন গ্যাস আছে। এসব গ্যাস রসায়নের বিচারে খুব নিষ্ক্রিয়, তাই রাসায়নিক পদ্ধতিতে এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সহজ নয়।

আমরা আগেই বলেছি, হেনরী কেভেণ্ডিসের পরীক্ষায় বাতাসের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাইঅক্সাইড অপসরণ করার পরও কিছু গ্যাস অবশিষ্ট ছিল। কেভেণ্ডিস এর ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এই পরীক্ষার প্রায় একশ' বছর পরে স্যার উইলিয়াম র‍্যামসে ঐ গ্যাসকে আরগন বলে চিহ্নিত করেন। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে ঘনত্ব মাপলে দেখা যায় যে তা বিশুদ্ধ নাইট্রোজেনের ঘনত্ব থেকে বেশি। এর কারণ, বাতাস থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনে সব সময় আরগন থেকে যায়।

অনেক উঁচু আকাশের বাতাসে ওজোন গ্যাস থাকে। ওজোন গ্যাসের স্তর বহির্বিশ্বের অতিবেগুনী রশ্মির আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করে। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ আজ এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে এই ওজোন স্তরও বিপন্ন।

স্থান কাল ভেদে বাতাসে কিছু কিছু অস্থায়ী গ্যাসের দেখা পাওয়া যায়। যেমন, কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় বাতাসে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাইঅক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফিউরিক অ্যাসিডের বাষ্প পাওয়া গেছে। এইসব রাসায়নিক পদার্থ-গুলি বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে এবং গাছপালা, নগর, অট্টালিকা, প্রাণী উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে। জীবনের পক্ষে অকল্যাণকারী এই বৃষ্টির নাম 'অম্ল বৃষ্টিপাত'।

নানারকম গ্যাস ছাড়া বাতাসে ভেসে বেড়ায় টন টন ধূলিকণা। শহরের বাতাসে যে কত ধুলো আছে তার খোঁজ কে রাখে? শীতকালে ধুলোর অংশ খুব বেড়ে যায়। ধুলোকে কেন্দ্র করে শীতের সন্ধ্যায় আসে ধোঁয়াশা। বাতাসে ধুলো থাকার জন্য সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে রক্তরাঙা দেখায়, আকাশ হয়ে ওঠে গভীর লাল। কিন্তু ধুলো মানুষ প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছে—আর তার জন্য শেষে একদিন তাকে ফুসফুসের ক্যান্সার, হাঁপানী—এইসব রোগে ভুগতে হচ্ছে। শুধু কি এই? মাঝে মাঝে স্থানীয় ঘটনার জন্য বাতাসের উপাদানে হেরফের হয়ে যায়। যেমন, আগ্নেয়গিরির কার্য-কলাপ। ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকোতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর বেশ কয়েক বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আকাশে যথেষ্ট ছাইয়ের কণা ঘুরে বেড়াতো। এই সেদিনের মেক্সিকোর আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তার জন্য আমেরিকার আকাশে ভস্ম, ধুলো, সালফার যৌগের প্রাচুর্য দেখা গেছে। এসব ঘটনার পর

আবহাওয়ায় যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। একদল বিজ্ঞানী মনে করেন, ডাইনোসরদের হঠাৎ বিলুপ্তির মূলে আছে হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন। বিরাট বিশাল এক উল্কার আঘাতে সমগ্র বায়ুমণ্ডল ধুলিধূসরিত হয়ে পড়ে, সূর্যালোক কমে যায়, শীতলতা বেড়ে ওঠে, আসে ডাইনোসরকূলে বিপত্তি।

এতক্ষণ যে বাতাস নিয়ে আলোচনা হল তা নিম্ন আকাশের বাতাস। আবহাওয়া মূলত এই নিচু আকাশেই সীমাবদ্ধ। তবে ঊর্ধ্বাকাশের বহু ঘটনাই নিম্ন আকাশে তথা আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এবার আমরা সেই ঊর্ধ্বাকাশের আলোচনায় আসি।

বাতাস-আকাশ-মহাকাশ

ঊর্ধ্ববায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুব বেশি দিনের পুরানো নয়। এমন কি শ' দুই বছর আগেও আমরা জানতাম না—মাথার উপর বাতাস কতটা ছড়ানো আছে। বড় বড় পাহাড় চূড়ায় ওঠার যোগ্যতা ছিল আমাদের—তার উপর উঠে শীতলতা ছাড়া আর কিছু বোঝা যেত না। গত শতাব্দীতেও দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের মঁ ব্লাঁ চূড়ায় উঠে তখনকার বিজ্ঞানীরা ঊর্ধ্বাকাশের বাতাস নিয়ে গবেষণা করতেন। মাইল তিনেকের উঁচু মঁ ব্লাঁ-এর থেকে আরো উঁচু জায়গার বাতাস সম্পর্কে আমাদের যে একদিন সম্যক জ্ঞান হবে তা তাঁরা ভাবতেই পারতেন না।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বাতাসের থেকে হালকা বেলুন আবিষ্কৃত হয়। বেলুনে থাকতো হাইড্রোজেন গ্যাস। পাঁচশো গ্রামের মতো হাইড্রোজেন ভরা বেলুন সহজেই সাত কিলোগ্রাম ওজনকে উড়িয়ে নিতে পারে। ১৮০৪ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী জোসেফ লুই গে লুসাক বেলুনে চড়ে প্রায় সাড়ে চার মাইল উঁচুতে গিয়ে বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করে আনেন। প্রথম দিকে বেলুন অভিযানে অনেকে বিপদের সামনে পড়েন—কেউ বাতাসের তোড়ে সমুদ্রের দিকে উড়ে যান, কারোর বেলুনে আগুন ধরে যায়, কেউ বা ঊর্ধ্বাকাশের অল্প অক্সিজেনে অজ্ঞান হয়ে পড়েন—তাছাড়া খুশীমতো বেলুন নিয়ন্ত্রণ করা যেত না। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বেলুন বিশেষজ্ঞ জাঁ পিয়েরী ব্লানচার্ড প্যারাসুট আবিষ্কার করেন এবং তার পর থেকে বেলুন অভিযানে বিপদ কমে আসে।

ঊর্ধ্বাকাশের পথে

বেলুন আবিষ্কারের আগে, কেবলমাত্র পাহাড়ে চড়েই বোঝা গিয়েছিল, ঊর্ধ্বাকাশের উষ্ণতা ক্রমশ কমে যায়। বেলুনে থার্মোমিটার বেঁধে দেখা গেল, সত্যসত্যই প্রায় সাত মাইল উঁচুতে বাতাসের উষ্ণতা কমে প্রায় —৫৫° সেন্টিগ্রেডে দাঁড়ায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, মাইল সাতেকের ঊর্ধ্বে, বাতাসের উষ্ণতা আরো না কমে বরং ধীরে ধীরে বাড়ে। ১৯০২ সালে

ফরাসী আবহাওয়াবিদ লিঁয় ফিলিপ তেসেরেঁ দ্যে বোর্ত বলেন যে বায়ুমণ্ডল প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। প্রায় সাত মাইল উঁচু প্রাথমিক স্তরের তিনি নাম দেন ট্রপোস্ফিয়ার। ট্রপোস্ফিয়ার কথাটির অর্থ-পরিবর্তনশীল স্থান। এই ট্রপোস্ফিয়ারে বাতাসের চলাচল, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, ঝড় ইত্যাদি সংগঠিত ও ক্রিয়াশীল হয়। ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের অংশের নাম দেওয়া হয় 'স্ট্রাটো-স্ফিয়ার'। এর অর্থ—যে স্থান স্তরে বিভক্ত বাতাস দিয়ে গঠিত। স্ট্রাটো-স্ফিয়ারের বাতাস খুব পাতলা—অনুমান করা হয়, খুব হালকা গ্যাসগুলি, যেমন হাইড্রোজেন, হিলিয়ামকে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে পাওয়া যেতে পারে। স্ট্রাটো-স্ফিয়ারের বাতাস একেবারেই আন্দোলিত হয় না, এখানে উচ্চতা বাড়লে উষ্ণতা বাড়ে। ট্রপোস্ফিয়ার আর স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝের অংশের 'ট্রপোপজ' নাম দেন বোর্ত—এর অর্থ ট্রপোস্ফিয়ারের শেষ। পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে যে ট্রপোপজের উচ্চতা স্থানবিশেষে পালটায়। মেরু অঞ্চলে যদি ট্রপোপজের উচ্চতা হয় পাঁচ মাইল, তাহলে বিষুবরেখার উপরে ট্রপোপজ দশ মাইল উর্ধ্বে অবস্থান করে।

১৯৩০ সালের আগে কোন মানুষ স্ট্রাটোস্ফিয়ারে পাড়ি জমাবার সাহস করেনি। অত হাল্কা বাতাসে অত ঠাণ্ডায় কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। ব্রাসেলস শহরের একজন সুইডিশ অধ্যাপক, নাম অগাস্ট পিকার্ড সশরীরে ওখানে যাবার পরিকল্পনা করেন। প্রথমেই তিনি একটা কেবিন তৈরি করালেন, কেবিনটা একটা বড় বেলুনে বেঁধে তিনি বায়ুমণ্ডলে প্রায় মাইল এগারো উঁচুতে উড়তে পেরেছিলেন। স্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য ওঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। অগাস্ট পিকার্ডের দেখাদেখি পরে অনেকে উর্ধ্বাকাশে বেলুন ও মানুষ পাঠাবার কাজে নেমে পড়লেন। ১৯৩৮ সালে 'এক্সপ্লোরার-দুই' নামে একটা বেলুন তের মাইল উঁচুতে উঠেছিল। ১৯৬০ সালে মানুষ নিয়ে একটি বেলুন উঠেছিল প্রায় চব্বিশ মাইল উপরে। মানুষ-বিহীন বেলুন প্রায় ত্রিশ মাইল পর্যন্ত উঠেছে। উর্ধ্বাকাশ গবেষণায় বেলুন মানুষকে যে কত সাহায্য করেছে তার তুলনা নেই। এখনো এই রকেটের যুগে আবহাওয়ার খবরাখবর জানার জন্য প্রায়ই বেলুন ব্যবহার করা হয়।

চীনারা এককালে হাউইবাজি আবিষ্কার করেছিল। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে কোন বলের ক্রিয়া সমানভাবে বিপরীত প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন

করে। হাউইয়ের বারুদ জ্বলে ওঠে, গ্যাস তীব্র গতি নিয়ে হাউইয়ের নিচে দিয়ে বের হয়, গ্যাস নিঃসরণের প্রতিক্রিয়ায় হাউই ঊর্ধ্বমুখে এগিয়ে যায়। হাউইয়ের নীতি অনুসরণ করে মধ্যযুগে ভারতীয় সৈনিকরা আগুন বোঝাই রকেট ব্যবহার করতো। আধুনিক রকেট, যা একরকম হাউই, তার আবিষ্কার হয়েছিল অনেক পরে। ঊর্ধ্বাকাশ ও মহাকাশ গবেষণার জন্য রুশ বিজ্ঞানী কনস্টানটিন ইডুআরডোবিচ ট্‌সিওল কোভ্‌স্কি এবং আমেরিকান বিজ্ঞানী রবার্ট হাচিংগস গড্ডারড আধুনিক রকেটের মডেল তৈরি করেছিলেন। রকেটে সাধারণত তরল জ্বালানী ও তরল অক্সিজেন নেওয়া হয়, জালানি ও অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে পোড়ানো হয়, দহনজাত গ্যাসের স্রোত রকেটের পশ্চাত দিয়ে নিঃসরিত হয়, গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় রকেট ঊর্ধ্বমুখে অগ্রসর হয়। মনে রাখা দরকার, এরোপ্লেন ও রকেটের চলার রীতি সম্পূর্ণভাবে আলাদা। এরোপ্লেন বাতাসে ভর দিয়ে চলে—যেখানে বাতাস নেই সেখানে এরোপ্লেন ওড়ে না। কিন্তু রকেট বাতাসহীন সম্পূর্ণ শূন্যদেশে সুন্দরভাবে উড়তে পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানরা V-2 রকেট বানিয়েছিল, কিন্তু তারা এ-রকেট ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি। যুদ্ধের শেষে V-2 রকেট আমেরিকানদের হাতে পড়ে, তারাই প্রথম এই রকেট দিয়ে শূন্যে ১২৮ মাইল উঁচুতে বাতাসের কি বৈশিষ্ট্য তা জানতে পারে। এরপর সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশ গবেষণায় এগিয়ে আসে। সত্যি বলতে কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের যুগকে আমরা রকেটের যুগও বলতে পারি।

রকেটের সাহায্যে স্ট্রাটোস্ফিয়ার নিয়ে বিশদ গবেষণা হয়। এই সময় জানা গেল যে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উষ্ণতা ভূমি থেকে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে বাড়ে, ত্রিশ মাইল উঁচুতে উষ্ণতা −১০°, তারপর উষ্ণতা কমে যায়, কমে কমে পঞ্চাশ মাইল উঁচুতে তা −৯০° সেন্টিগ্রেড হয়। বায়ুমণ্ডলের যে অংশে এভাবে উষ্ণতা বাড়ে, কমে তাকে 'মেসোস্ফিয়ার' বলা হয়। মেসোস্ফিয়ারের পরে বাতাসের উষ্ণতা আবার বাড়ে, অবশ্য ততক্ষণে বাতাস বলতে প্রায় কিছুই নেই, সমস্ত বায়ুমণ্ডলের শতকরা একভাগ অংশ মেসোস্ফিয়ারের উঁচু আকাশে অবশিষ্ট রয়ে যায়।

ঊর্ধ্বাকাশে অর্থাৎ মেসোস্ফিয়ারের পরে উষ্ণতা বাড়তে বাড়তে প্রায়

১০০০° সেন্টিগ্রেড হয়। তখন উচ্চতা প্রায় ৩০০ মাইল। সূর্যের বিকিরণ নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। বায়ুমণ্ডলের এই অংশের নাম 'থার্মোস্ফিয়ার'। তিনশ মাইল উপর থেকে শুরু হয় 'এক্সোস্ফিয়ার'—এক্সোস্ফিয়ার প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর মহাকাশ, আন্তর্নাক্ষত্রিক প্রদেশ।

উর্ধ্বাকাশ
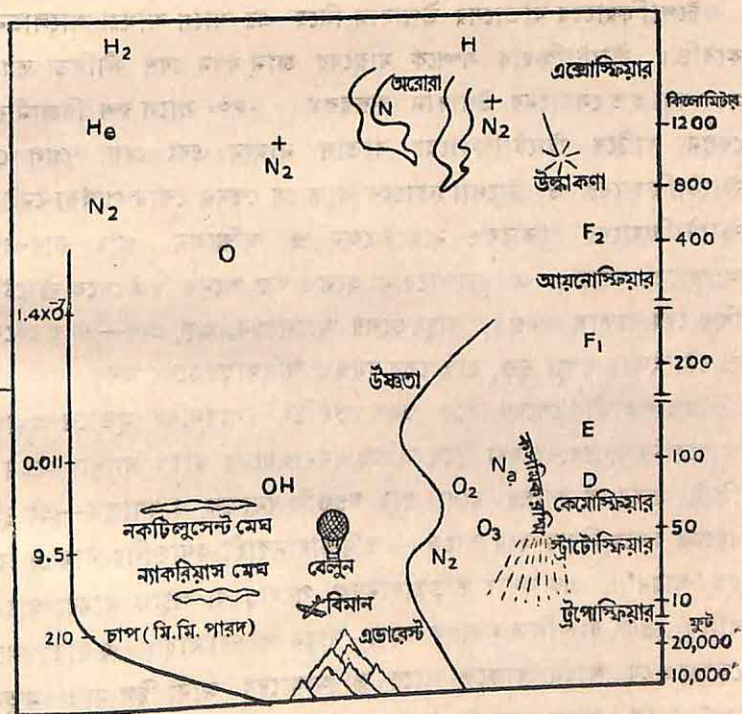
আমরা আগে বলেছি যে বাতাসের জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে বাতাসের উষ্ণতা বাড়িয়ে তোলে। ট্রপোস্ফিয়ার ধরে যত উপরে ওঠা যায় তত ঐ দুটি যৌগিক পদার্থ কমে আসে, অবলোহিত রশ্মির শোষণের মাত্রা কমে যায়—উঁচুদিকে বাতাসের উষ্ণতা হ্রাস পায়। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বাতাসে কিছুটা ওজোন গ্যাস আছে। ওজোন অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে, রশ্মি শোষণে এখানে আবার উষ্ণতা বেড়ে ওঠে। কিন্তু স্ট্রাটোস্ফিয়ারের শেষের দিকে অর্থাৎ মেসোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাস নেই বললেই চলে, তাই মেসোস্ফিয়ারে আবার উষ্ণতা

নিচের দিকে নেমে যায়। থার্মোস্ফিয়ারে গ্যাস বলতে প্রায় কিছুই নেই, আলো শোষণের উপাদানও নেই, নিরবিচ্ছিন্ন সূর্যকিরণ উষ্ণতা বাড়িয়েই চলে।

আয়োনোস্ফিয়ার

ট্রপোস্ফিয়ারের বাতাসের উপাদান নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছি। স্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যখন বেশ সীমিত তখন মনে করা হত সেখানের উপাদান অন্যরকম। ১৯৩০ সালে রুশ বিজ্ঞানীরা বেলুন পাঠিয়ে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বাতাস নামান এবং দেখা গেল যে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ও ট্রাপোস্ফিয়ারের বাতাসে তেমন কোন পার্থক্য নেই। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বাতাসেও নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন প্রায় চার-এক অনুপাতে আছে। এ ব্যাপারে না হলেও অন্য অনেক দিক থেকে স্ট্রাটো-স্ফিয়ারের বাতাস অনন্য। বায়ুমণ্ডলের আলোড়ন, ঝড়, মেঘ—এসব থেকে স্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্পূর্ণ মুক্ত, বাতাসের ঘনত্বও অবিশ্বাস্যরকমের কম।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে তরুণ সুইডিস রসায়নবিদ স্ভান্তে অগাস্ত আরহেনিয়াস দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িত গমনাগমনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে দ্রবণের মধ্যে দ্রাব অণুগুলি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক—এই দুই ধরনের কণায় বিভক্ত হয়ে আছে। তড়িতাধানবাহী কণাগুলির নাম দেওয়া হয় 'আয়ন'। এক কথায় তড়িতাধানযুক্ত পরমাণু বা অণুকে আমরা আয়ন বলি। দ্রবণ বা গলিত লবণের মধ্যে আয়ন পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্য কোথাও যে আয়ন থাকতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না। নতুন তথ্য আসে—বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বাকাশে আয়ন ছড়ানো আছে। কিভাবে তা জানা গেল ? আমরা সবাই জানি যে বেতার তরঙ্গ (যা আলোর তরঙ্গের সমতুল্য) সব সময় সরলরেখা ধরে যাতায়াত করে। কাছাকাছি দু'টি রেডিও স্টেশনের মধ্যে বেতার তরঙ্গ সরাসরি সংকেত আদানপ্রদান করতে পারে। কিন্তু ধরা যাক, আটলান্টিকের দু'পারের দুই মহাদেশ ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থিত দুই বেতার কেন্দ্রের বেলায় কি আদানপ্রদান সম্ভব ? আগে মনে করা হত—তা সম্ভব নয়। কারণ, পৃথিবীর পিঠ বাঁকানো বলে ইউরোপ থেকে আমেরিকা বা আমেরিকা থেকে ইউরোপে বেতার সংকেত পাঠানো সম্ভব নয়। কিন্তু গুগলিয়েলমো মারকনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ

থেকে আমেরিকায় বেতার তরঙ্গ পাঠাতে সক্ষম হলেন। কিভাবে তা হল? প্রায় ২০০০ মাইল বাঁকানো পথে তরঙ্গ গেল কিভাবে? ইংরাজ পদার্থবিজ্ঞানী অলিভার হেভিসাইড ও আমেরিকান যন্ত্রবিদ আর্থার এডউইন কেনেলি বলেন যে বেতার তরঙ্গ প্রথমে ঊর্ধ্বাকাশে সরাসরি উঠে যায়, সেখানে আছে আয়ন কণার স্তর, সেই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে নিচে নেমে আসে। ব্যাপারটা আয়নার প্রতিফলনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই আয়ন স্তরের নাম দেওয়া হল 'কেনেলি-হেভিসাইড স্তর'।

ঊর্ধ্বাকাশে আয়ন আছে—একথা বলা এক, আর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা আর এক। অনেক সময় লেগেছিল এই গবেষণায়। ১৯২০ সালে ইংরাজ পদার্থবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ভিক্টর অ্যাপ্লেটন আয়নের পরীক্ষা-মূলক প্রমাণ দেন। পরে অ্যাপ্লেটনকে এই সব কাজের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁর গবেষণায় জানা যায় যে কেনেলি-হেভিসাইড আয়ন স্তর প্রায় ৬৫ মাইল উঁচুতে অবস্থিত। ভোরের দিকে অর্থাৎ সূর্যতাপ যখন ঊর্ধ্বাকাশ স্পর্শ করেনি, কেনেলি-হেভিসাইড আয়ন স্তর বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে না, সেসময় প্রায় ১৪০ মাইল ঊর্ধ্বে আর একটি আয়ন স্তর (যার পরে নামকরণ হয়—অ্যাপ্লেটন স্তর) বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত করে। সামগ্রিকভাবে বায়ুমণ্ডলের এই অংশের নাম—'আয়োনোস্ফিয়ার'। আয়োনোস্ফিয়ার আসলে মেসোস্ফিয়ার ও থার্মো-স্ফিয়ার জুড়ে ছড়ানো আছে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের শেষ থেকে প্রায় ৬৫ মাইল উঁচু আয়োনোস্ফিয়ারকে D-অংশ বলা হয়, এর উপরে আছে কেনেলি-হেভিসাইড স্তর বা D-স্তর। D-স্তরের পর ১৪০ মাইল লম্বা হল E-অংশ, এখানে আয়নের সংখ্যা কম। তার উপরে আছে অ্যাপ্লেটন স্তর। অ্যাপ্লেটন স্তর দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ F_1 স্তর—যেখানে আয়নঘনত্ব বেশি, পরের ভাগের নাম F_2 স্তর। সবার শেষের আয়োনোস্ফিয়ারকে F-অংশের আয়োনোস্ফিয়ার বলে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। মহাকাশ থেকে ভেসে আসা (বেতার নক্ষত্র থেকে) ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে আয়োনোস্ফিয়ার প্রতিফলিত করে না। এই ক্ষুদ্র মাপের তরঙ্গগুলি বায়ুমণ্ডলকে ভেদ করে পৃথিবীতে আসতে পারে বলেই বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা (Radio Astronomy) গড়ে

উঠতে পেরেছে। ক্ষুদ্র রেডিও তরঙ্গগুলিকে আয়োনোস্ফিয়ার প্রতিফলিত করতে পারে না বলে একটি অসুবিধা আছে। আমরা জানি, টেলিভিসনের জন্য যে বেতার তরঙ্গ ল্যাগে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব কম। টেলিভিসন থেকে প্রেরিত তরঙ্গ তাই আয়োনোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত না হয়ে সোজা মহাকাশে পাড়ি জমায়। এই কারণে টেলিভিসনের ছবি দূরদেশে পাঠানো যায় না। ঘরে বসে আমরা বি. বি. সি. শুনতে পারি, কিন্তু আমাদের টি. ভি. সেটে ব্রিটেনের টি. ভি. ছবি দেখতে পাই না। আজকাল অবশ্য মহাকাশে ভূসম বলয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ বসিয়ে, সেখান থেকে রিলে করে টি. ভি.-এর ছবি দূর দেশে, এমনকি পৃথিবীর বিপরীত পিঠেও পাঠানো যায়। আয়োনো-স্ফিয়ারের এ ব্যাপারে কিছু করার নেই।

একটা জিনিস গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা গেছে—সন্ধ্যার দিকে আয়োনো-স্ফিয়ার খুব সক্রিয় হয় এবং ভোরের দিকে সক্রিয়তা হ্রাস পায়। এর কারণ বোঝা সহজ। সারাদিন সূর্যের তাপে উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডলের অণু পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়ে আয়নিত হয়—সন্ধ্যার দিকে আয়নের ঘনত্ব বাড়ে। কিন্তু সারারাত সূর্যের আলোর অভাবে ঐ আয়নগুলি আবার ইলেকট্রন গ্রহণ করার সুযোগ পায়, অণু পরমাণু ফিরে আসে। আয়নের ঘনত্ব হ্রাস পাওয়ায় আয়োনোস্ফিয়ার শেষ রাতে দুর্বল হয়ে পড়ে।

উর্ধ্বাকাশ রসায়ন

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বাতাসের উপাদানগুলি ট্রপোস্ফিয়ার থেকে আলাদা না হলেও, আরো উর্ধ্বাকাশের বাতাসে নতুন কয়েকটি উপাদান খুঁজে পাওয়া গেছে। উর্ধ্বাকাশে এক রকম আলোর আভা অনেকেই দেখেছেন। চন্দ্রহীন আকাশে এই নভোপ্রভা পরিষ্কার দেখা যায়। নভোপ্রভার বর্ণালী বিশ্লেষণের পর কোন কোন বিজ্ঞানী বললেন যে উর্ধ্বাকাশের নাইট্রোজেন, অক্সিজেন পরমাণু নভোপ্রভার উৎস। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিডনী চ্যাপম্যান নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী বললেন, সূর্যের তাপে নাইট্রোজেন-অক্সিজেন অণু পরমাণু স্তরে ভাঙ্গে, তারা আবার রাতের শীতলতায় জুড়ে যায়। অণু থেকে পরমাণু হবার সময় তারা যে শক্তি সংগ্রহ করেছিল, রাতে পরমাণু থেকে অণু

হবার সময় সেই শক্তি আবার ফিরিয়ে দেয়। ফিরিয়ে দেওয়া এই আলোক শক্তিই নভোপ্রভা বা Air Glow। চ্যাপম্যানের মতে নভোপ্রভা আর কিছুই নয়, দেরিতে পাওয়া সূর্যের আলো।

এরপর রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশে স্পেক্ট্রোস্কোপ পাঠিয়ে সত্যি অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের পরমাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেল। এই সময় ঊর্ধ্বাকাশে সোডিয়াম ধাতুও পাওয়া গেল। খুব অবাক হবার মতো কথা যে অত উঁচুতে সোডিয়াম আছে। প্রশ্ন ওঠে, ওখানে সোডিয়াম গেল কিভাবে? অনেক বিজ্ঞানী বলেন, সমুদ্রের জল বাষ্পায়িত হবার সময় সোডিয়াম ক্লোরাইড বা নুনের কণা বাতাস ভাসিয়ে আনে, বাতাসের নুনই কোনভাবে ঊর্ধ্বাকাশে গিয়ে হাজির হয়েছে। শুধু সোডিয়াম কেন, লিথিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদির পরমাণুর হদিশ মিলেছে পঞ্চাশ ষাট মাইল উপরে। একদল বিজ্ঞানী বলেন, উল্কাগুলি যখন ঊর্ধ্বাকাশে জ্বলে পুড়ে যায় তখন সেখান থেকে এসব ধাতু আসে। কৃত্রিমভাবে রকেটে করে সোডিয়াম, নাইট্রিক অক্সাইড বাষ্প ছড়িয়ে নভোপ্রভা সৃষ্টি করা গেছে। তার মানে, নভোপ্রভার পিছনে যে বিভিন্ন জাতের অণু পরমাণুর হাত আছে তাতে সন্দেহ নেই। রকেটিয় পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে বেশির ভাগ ধাতু বা ধাতব আয়নগুলি বায়ুমণ্ডলের E অঞ্চলে আছে। সূর্যের তাপে বা উল্কাদহনের তাপে ধাতুগুলি আয়নিত হয়েছে। আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইরা স্পারাগু বোয়েন ১৯২৭ সালে বললেন যে ঊর্ধ্বাকাশে আণবিক অক্সিজেন নেই, আছে পারমাণবিক অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলের নিচের দিকে পারমাণবিক অক্সিজেন পাওয়া যায় না। দুটি পরমাণু মিলে অক্সিজেন অণু গড়ে তোলার বদলে নিম্ন আকাশে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে ওজোন অণু তৈরি করে। মাইল পনের উঁচুতে সবচেয়ে বেশি ওজোন গ্যাস আছে বলে এই জায়গাটাকে ওজোনোস্ফিয়ার (ozonosphere) বলে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পদার্থবিদ চার্লস ফ্যাবরি ওজোনোস্ফিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন। মাটির কাছাকাছি বাতাসে ওজোন গ্যাস নেই। মাঝে মধ্যে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সময় ঊর্ধ্বাকাশ থেকে জলের সঙ্গে মিশে ওজোন গ্যাস মাটিতে নামে। এজন্য জোরালো বৃষ্টির সময় কখনো কখনো ওজোনের পরিচিত আঁশটে গন্ধ বাতাসে পাওয়া যায়।

দু'শ মাইলের উপরে বাতাস প্রায় নেই। শুধু একটা হালকা হিলিয়াম

গ্যাসের স্তর ভাসে—আজকাল যার নাম দেওয়া হয়েছে 'হেলিওস্ফিয়ার'। ১৯৬৩ সালে 'এক্সপ্লোরার টোয়েন্টি সেভেন' একে খুঁজে পায়। হেলিও-স্ফিয়ারের উপরে আছে আরো পাতলা হাইড্রোজেন গ্যাসের স্তর—এর নাম 'প্রোটনস্ফিয়ার'। আমরা এর আগে বলেছি, হাইড্রোজেন হিলিয়াম অণুগুলি হালকা বলে তারা প্রায়ই মহাকাশে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব হাইড্রোজেন-হিলিয়াম যে প্রস্থান করে তা নয়। তেজস্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন হিলিয়াম গ্যাস বাতাসে আসছে আর উর্ধ্বাকাশে সূর্যের তাপে আলোয় জলের অণু ভেঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। কিন্তু এদের একটা অংশ মহাকাশে উধাও হয় না। কেন? কারণ দিনের বেলায় বিকিরণের প্রভাবে হাইড্রোজেন হিলিয়াম আয়নিত হয়, আয়নিত হিলিয়াম হাইড্রোজেন পৃথিবীর চৌম্বক বলয়ে (ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েসন বেল্ট) আটকে যায়। তবে চৌম্বক মেরুদুটি বরাবর হাইড্রোজেন হিলিয়াম সটান মহাকাশে নিষ্ক্রান্ত হয়—এর নাম মেরু বায়ু (Polar Wind)।

উর্ধ্বাকাশের বাতাসের গঠন, স্বভাব, বৈশিষ্ট্য নিম্ন আকাশের বাতাসের থেকে একেবারে আলাদা। যে সব গ্যাস এখানে আছে তারা পরিমাণে অল্প, এক তীব্র বিকিরণ মণ্ডলের মধ্যে তাদের থাকতে হয়। দিনে ও রাতে বিকিরণের মাত্রায় ফারাকও প্রচুর। গ্যাসীয় অণু পরমাণু আয়নী-ভবনের মধ্য দিয়ে বা আয়নের তড়িতাধানহীন অণু পরমাণুতে রূপান্তরের মধ্য

	যারা শোষণ করে	যেখানে শোষিত হয়
বহির্পৃথিবীজাত		
এক্স-রশ্মি	পারমাণবিক অক্সিজেন, আণবিক নাইট্রোজেন, অক্সিজেন	আয়োনোস্ফিয়ার
অতি বেগুনী রশ্মি	অক্সিজেন, ওজোন	থার্মোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার
দৃশ্য রশ্মি	কেহ শোষণ করে না	কোথাও শোষিত হয় না
অবলোহিত রশ্মি	কার্বন-ডাইঅক্সাইড, ওজোন	স্ট্রাটোস্ফিয়ার
ভূপৃষ্ঠজাত		
অবলোহিত রশ্মি	কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প	ট্রাপোস্ফিয়ার

দিয়ে আলো তাপের শোষণ ও বিকিরণ হয় এবং তার জন্য উর্ধ্বাকাশে নানান ঘটনা দেখা যায়। এর মধ্যে একটা হল 'মেরুজ্যোতি'। উর্ধ্ববায়ুমণ্ডলে যে রাসায়নিক পরিবর্তনগুলি ঘটে তাকে জানা-বোঝার জন্য রসায়ন বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা গড়ে উঠেছে। মাটিতে বসে, স্বাভাবিক বায়ুর চাপে যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া অসম্ভব বলে মনে হয়, তা এই উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের অস্বাভাবিক নিম্নচাপে সম্ভব।

এর আগে আমরা আলোচনা করেছি যে উর্ধ্বাকাশে আয়নের উপস্থিতি প্রশ্নাতীত। অনেকদিন ধরে একটা চিন্তা আমাদের মাথায় ছিল—এই আয়ন বায়ুমণ্ডলের কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। রকেটের যুগে এ বিষয়ে গবেষণা সহজ হল। কৃত্রিম উপগ্রহে গাইগার কাউণ্টার (একরকম বিকিরণ খোঁজার যন্ত্র) পাঠিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হল। খবর পাওয়া গেল—উর্ধ্বাকাশে যে আয়নকণা আছে তাই নয়, সূর্য থেকে ঝলকে ঝলকে মারাত্মক সব রশ্মি, কণা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। ১৯৫৮ সালে আমেরিকার 'এক্সপ্লোরার-ওয়ান' কৃত্রিম উপগ্রহ খবর দিল যে প্রায় দু'হাজার মাইল উপরে বিকিরণ মাত্রা দুর্বল। রুশ কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুতনিক-থ্রি' এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করল। দু'হাজার মাইল উপরে আয়নের ঘনত্ব কম—এ কথা তত্ত্ববিদরা মানতে চাইলেন না। আয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস ভ্যান অ্যালেন এবং তাঁর সহযোগীগণ বললেন যে গাইগার কাউণ্টারের তথ্য ঠিক নয়, বিকিরণ কম নয়, বরং ঐখানে বিকিরণ খুব বেশি বলেই গাইগার কাউণ্টার তা মাপতে ব্যর্থ হয়েছে। যন্ত্রের ক্ষমতার তুলনায় বেশি বিকিরণ মাপতে হয়েছে বলেই এই বিপত্তি।

পরে শক্তিশালী যন্ত্র পাঠিয়ে দেখা গেল যে ভ্যান অ্যালেনরাই ঠিক। সত্যসত্যই দেড় হাজার মাইলের উপরে কল্পনাতীত পরিমাণ বিকিরণ বিরাজ করছে। পৃথিবীর চারদিকে একটি শক্তিশালী বিকিরণ বলয় আছে। বলয়ের উপর সব সময় মহাকাশ থেকে নানান রশ্মি, মহাজাগতিক কণা, তেজস্ক্রিয় কণারা আছড়ে পড়ছে, বলয় দু'হাতে তাদের বাধা দিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করছে। ভ্যান অ্যালেনের সম্মানে পৃথিবী-বেষ্টিত বলয়ের নামকরণ হল 'ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়'।

এখন প্রশ্ন, বলয়ের উৎস কোথায়? বলয়ের উৎস—আমাদের পৃথিবী। আমরা সবাই জানি যে পৃথিবী নিজেই একটা বড় চুম্বক। আর যে কোন

চুম্বকের মতো পৃথিবী—চুম্বকের চারদিকে চৌম্বক বলরেখা আছে। বলরেখাগুলি আবদ্ধ বলয় গঠন করেছে—যারই নাম ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়।
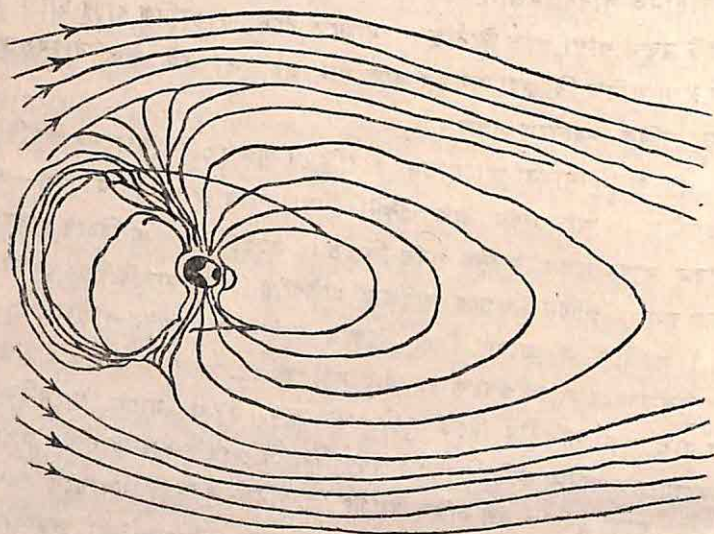
ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়

ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের নাম পরিবর্তিত হয়ে আজকাল 'ম্যাগনেটোস্ফিয়ার' বলা হয়।

ভাগ্যি আমাদের পৃথিবী একটি চুম্বক। তাই তার চারদিকে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার তৈরি হয়েছে, ম্যাগনেটোস্ফিয়ার মহাকাশের বিধ্বংসী বিকিরণ থেকে তাবৎ প্রাণিকূলকে রক্ষা করছে!

ম্যাগনেটোস্ফিয়ার থাকার জন্য পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে একটি অসামান্য সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। তার নাম মেরুপ্রভা বা অরোরা।

মেরুপ্রভা

উত্তর মেরুর কাছাকাছি, যেমন আলাস্কা, উত্তর কানাডার রাতের আকাশে মাঝে মাঝে আলোর ছটা দেখা যায়। যাঁরা এই আলো একবার দেখেছেন তাঁরা কখন-ও এর সৌন্দর্য ভুলতে পারেন না। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে

ফরাসী দার্শনিক পেরী গাসেণ্ডী উত্তর মেরুজ্যোতির নাম দেন 'অরোরা বোরিয়ালিস'। শব্দটি লাতিন, এর মানে হল—উত্তরের ভোর। শুধু উত্তর মেরু অঞ্চলে নয়, দক্ষিণে অর্থাৎ আণ্টার্কটিকাতেও মেরুজ্যোতি দেখা যায়। দক্ষিণ মেরুজ্যোতির নাম দেওয়া হয়েছে 'অরোরা অস্ট্রালিস'।

পৃথিবী একটি অক্ষরেখার চারপাশে চব্বিশ ঘণ্টায় এক পাক দিচ্ছে। এই অক্ষরেখাটি পৃথিবীকে দু'টি বিন্দুতে ফুঁড়ে গেছে। বিন্দু দু'টির একটি ভৌগোলিক উত্তর মেরু, অন্যটি ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু। আমাদের পৃথিবী আবার নিজেই একটা বড়সর চুম্বক। ভূ-চুম্বকের মেরু দু'টি কিন্তু ভৌগোলিক মেরুতে অবস্থান করে না। ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরুকে ভৌগোলিক উত্তর মেরু থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে কানাডার প্রান্তে পাওয়া গেছে। তেমনি, পৃথিবী-চুম্বকের দক্ষিণ মেরু আণ্টার্কটিকার রস সাগরের পশ্চিম দিকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। ভূ-চুম্বকের মেরুর কাছাকাছি জায়গায় সবচেয়ে বেশি মেরুজ্যোতি দেখা যায়। মেরুজ্যোতিছটা মাঝে মাঝে এত দীপ্তিময় হয় যে সুদূর দক্ষিণের বোস্টন বা নিউইয়র্ক শহর থেকে তা পরিষ্কার দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন, মেরুজ্যোতির এত আলো কোথা থেকে আসে ? পৃথিবী নিজেই একটা চুম্বক বলে তার চারপাশে চৌম্বক বলরেখা আছে। মহাকাশ থেকে সব সময় নানান গ্যাস, গ্যাসধূলি, আয়ন পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। তড়িৎ-আধান লেগে থাকা আয়নগুলি ভূ-চুম্বক বরাবর আটকে গিয়ে একটি বিকিরণ বলয় তৈরি করেছে। পৃথিবীকে ঘিরে থাকা এই বলয়ের নাম 'ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়'। দিনের বেলায় ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় চল্লিশ হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, আর রাতে বেড়ে হয় লক্ষাধিক মাইল। সূর্যের কিরণ ঊর্ধ্ব আকাশের গ্যাসকে আয়নিত করে এবং আয়নগুলি চুম্বক বলরেখা বরাবর ছড়িয়ে যায়। রাতে আয়নগুলি ভূ-চুম্বক মেরুর আকাশ বরাবর ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় রেখা ধরে তড়িৎ-আধান ত্যাগ করতে থাকে। আয়নের তড়িতাধান বর্জনের মধ্য দিয়ে মেরুজ্যোতি জন্ম নেয়।

সূর্যের গায়ে মাঝে মাঝে কালো দাগ ফুটে ওঠে। এ হ'ল সৌরকলঙ্ক। প্রায় সাড়ে এগারো বছর পর পর সৌরকলঙ্ক খুব বেড়ে যায়। সূর্যের গায়ে কলঙ্ক দেখা দিলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিবর্তন ঘটে। আয়োনো-

স্ফিয়ার অস্থির হয়ে পড়ে, রেডিওতে সব স্টেশন ধরা যায় না এবং মেরু-জ্যোতির ঘনঘটা বেশ বেড়ে যায়। কিন্তু কেন? সৌরকলঙ্কের গভীর গহ্বর থেকে নানান রশ্মি, তড়িতাধান যুক্ত কণা (সৌরঝটিকা) উঠে এসে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ে আছড়ে পড়ে। এ সময় এই রশ্মির মাত্রা অন্যান্য দিনের থেকে বহুগুণ বেশি হয়। অতিরিক্ত রশ্মি পৃথিবীতে বিপত্তি ডেকে আনে। এ-ও একরকম ঝড়—নাম 'চৌম্বক ঝড়'। সৌরঝটিকা মানুষের দৈনন্দিন কাজে প্রভাব বিস্তার করে। বাতাসের ঊর্ধ্বাঞ্চলে আয়নের পরিমাণ বাড়িয়ে আবহাওয়ার তারতম্য ঘটায়। শ'তিনেক বছর আগে সৌর-কলঙ্ক তথা সৌরঝটিকার হেরফেরের জন্য ইউরোপে একটি ক্ষুদে তুষার যুগ নেমে এসেছিল।

বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে কত মজাদার ঘটনাই না ঘটে। তাদের একটা হল 'তারা খসা'। মহাকাশ থেকে প্রায় সব সময় নানান মাপের উল্কা খণ্ড পৃথিবীতে ছুটে আসে। এদের বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত পায়ের তলায় পৃথিবীর মাটি পায় না, মাঝপথে বাতাসে ঘষা লেগে জলে যায়। খুব অন্ধকার অথচ নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে প্রায়ই আমরা আকাশের একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটে যাওয়া এমন আলোর রেখা দেখি।

উল্কার সঙ্গে মহাকাশের ধুলোও পৃথিবীতে পড়ছে। এদের পরিমাণ মোটেই কম নয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে প্রতিবছর পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন উল্কাধূলি পড়ে, পাঁচশ উল্কা আছাড় খায়। এর থেকে ঢের ঢের বেশি উল্কা আকাশ পথে হারিয়ে যায়। কাচের মতো চকচকে উল্কা মাঝে মধ্যে ছিটকে চলে আসে, এদের নাম 'টেকটাইট'।

ঊর্ধ্বাকাশের আলোচনা শেষ পর্যন্ত মহাকাশ আলোচনায় টেনে নেবে বলে এখানেই থামছি। ঊর্ধ্বাকাশ, নিম্নাকাশ একসাথে আমাদের পরিমণ্ডলে যে আবহাওয়ার জন্ম দেয় সে বিষয়ে এবার দু'চার কথা বলি।

আবহাওয়ার ইতিকথা

আবহাওয়া বলতে আমরা কি বুঝি ? জলবায়ুই বা কি ? কোন স্থানে কোন এক সময়ে বায়ুমণ্ডলের যে অবস্থা, অর্থাৎ চাপ, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, বাতাসের গতিবেগ, বৃষ্টি, কুয়াশা, মেঘ ইত্যাদি, তাকে একযোগে আবহাওয়া বলে। আর অনেকদিনের আবহাওয়া মিলে যে অবস্থাটার সৃষ্টি করে তাকে জলবায়ু বলি। কোন অঞ্চলের জলবায়ু যে শুধুমাত্র বায়ুমণ্ডলের উপর নির্ভর করে, তা নয়। সেই স্থানের উচ্চতা, সমুদ্রতীর থেকে সে স্থান কত দূরে আছে, সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল হলে নিকটস্থ সমুদ্রস্রোতের বৈশিষ্ট্য, কাছাকাছি পাহাড়, বন, মরুভূমি আছে কি না—ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর জলবায়ু নির্ভর করে। সত্যিই তো, হিমালয়ের পায়ের নীচের তরাইয়ের সঙ্গে দার্জিলিং-এর জলহাওয়ার কত তফাৎ ! স্থানবিশেষের অক্ষাংশও খুব জরুরী। অক্ষাংশ যত বাড়ে—দিন ও রাতের ফারাক তত বাড়ে। সমুদ্রতল ছাড়িয়ে উপরে উঠলে উষ্ণতা কমে যায়, প্রতি ১৫৫ মিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে উষ্ণতা প্রায় ১° কমে। জলবায়ুর ব্যাপারটা বুঝতে হলে এসব তথ্য মাথায় রাখতে হবে।

কোন অঞ্চলের আবহাওয়া নির্ভর করে প্রধানত সূর্যের উপর। বছরে কতটা সূর্যতাপ সে জায়গা পেল, তা জানা দরকার। আবহাওয়াবিদরা এদিকে প্রথম নজর দেন। সূর্য লম্বভাবে কিরণ দিলে যতটা তাপ উৎপন্ন হবে, তির্যকভাবে কিরণ দিলে নিশ্চয় ততটা হবে না। কোন স্থানের ভৌগোলিক অক্ষাংশ যত বেশি তত সেখানে সূর্যের আলো বেশি হেলিয়ে পড়বে। ইউরোপের দেশগুলির অক্ষাংশ বেশি—সেখানে শীতও বেশি। গরমকালে গরম বেশি, সূর্য তখন মাথার উপর থাকে, সূর্যের আলো লম্বভাবে মাটিতে পড়ে। তাছাড়া, সূর্যের কিরণের কতটা পৃথিবী শোষণ করছে, আর কতটা প্রতিফলিত করছে, তার উপরেও উষ্ণতা নির্ভর করে। বিভিন্ন পদার্থের প্রতিফলন ক্ষমতা বিভিন্ন। যেমন, শ্বেতশুভ্র বরফ সূর্যকিরণকে অনেকখানি প্রতিফলিত করে আকাশে ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু গাছপালা, মাটি

সূর্যের তাপকে শোষণ করে বেশি, ফেরায় কম। কে কতটা সূর্যরশ্মি ফিরিয়ে দেয় তার একটা শতকরা হিসাব দেওয়া হল।

জল	১০—৪০
ঘাস	১০—২০
বরফ	৭৫
বনভূমি	৫
মাটি	৫—১৫
বালি	২৫

পৃথিবীর অনেকটা জায়গা জল দিয়ে ঢাকা, জলের সূর্য-রশ্মি প্রতিফলনের ক্ষমতা বেশি বলে মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে বেশ উজ্জল দেখায়। চাঁদে বসে 'পৃথিবীর জ্যোৎস্না' উপভোগ করা সম্ভব। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার ফালির চাঁদের পাশে যে হালকা আলোয় উদ্ভাসিত চাঁদের বাকি অংশ আমরা দেখি তা ঐ প্রতিফলিত পৃথিবীর আলো বা 'পৃথিবীর জ্যোৎস্না'। মাটি, পাথর, ইত্যাদি সূর্যের তাপ শোষণ করে। এরা গরম হলে তাদের লাগোয়া বাতাস গরম হয়, গরম বাতাস নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, উষ্ণতা ছড়িয়ে যায়।

কোন স্থানের জলবায়ু যে চিরকাল একরকম থাকে তা নয়, বদলও হয়। আজকের মরুভূমিতে একদিন বৃষ্টিপাত হত। আজকের শুষ্ক প্রান্তরের উপর দিয়ে একদিন প্রবাহিত হয়েছে হিমবাহ। পৃথিবীর উপর দিয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা তুষার যুগ চলে গেছে, এর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

এক একটা অঞ্চলের আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন অবশ্য দু'চারশ বছরে হয় না। ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি সম্পূর্ণ হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে, তাই আবহাওয়ার বদলও হয় লক্ষাধিক বছর পর। কিন্তু মানুষের হাত পড়েছে আজ সব দিকে। কয়েক দশকের মধ্যে বন কেটে বসত হচ্ছে। বাঁধ দিয়ে নদীখাত পালটানো হচ্ছে, মরুভূমিকে চাষযোগ্য করা হচ্ছে। তাই ব্যাপকভাবে না হলেও কিছু কিছু আবহাওয়ার পরিবর্তন দু'চার দশকের মধ্যে চোখে পড়ে। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ভারতে মৌসুমী বায়ুর জোর ক্রমশ কমছে, আগের থেকে বর্ষাকালের পরিধি কমেছে। মনে আছে, চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুর, অণ্ডাল, পানাগড়,

দামোদরের ওপারের বেলিয়াতোড়, মেজিয়াতে ছিল বিশাল শাল বন, আবহাওয়া ছিল অনেক স্নিগ্ধ। আজ সেই বন কেটে কারখানা বসেছে, বসেছে বাড়িঘর, আবহাওয়া হয়েছে ভ্যাপসা, উষ্ণতা বেড়েছে অস্বাভাবিক-ভাবে, এমনকি বায়ুচলাচলের দিক বদল হয়েছে।

আজ যেমন চেষ্টা হচ্ছে থর মরুভূমিকে চাষযোগ্য করার—কয়েক হাজার বছর আগে ঐ থর মরুভূমিই গভীর বনে আচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন কালে আবহাওয়া কেমন ছিল তার সাক্ষ্য বহন করে বৃক্ষ। বৃক্ষের কাণ্ড ছেদ করলে যে সমকেন্দ্রিক রেখাগুলি পাওয়া যায়, তাদের পরস্পরের দূরত্ব তৎকালীন আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু হদিশ দেয়। প্রতি বছরে নতুন বৃত্তাকার রেখা জন্মায়। যে বছরে দু'টি বৃত্তাকার রেখার অন্তর্বর্তী ফাঁক তুলনামূলকভাবে বেশি, বুঝতে হবে সে বছরে বৃষ্টিপাত হয়েছিল প্রচুর—গরমও পড়েছিল ভালো। অন্যথায় শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়া ছিল।

প্রাচীন সাহিত্য ও পুঁথিতে তৎকালীন আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু জানা যায়। মেঘদূতের 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' উল্লেখের মধ্যে জানতে পারি, কোন্ সময় মধ্যভারতে বর্ষার মেঘ আসতো।

আবহাওয়ার ভবিষ্যদবাণী করা মোটেই সহজ নয়, আবহাওয়া দিনে দিনে বদলে যায়। আজকাল তো এসব করতে কম্প্যুটার, স্যাটেলাইট থেকে শুরু করে রাডার ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সারা বছরের আবহাওয়া বা জলবায়ু বোঝা, ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। যেমন পশ্চিমবাংলায় কোন্ দিন বৃষ্টি হবে বলা না গেলেও বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই আগষ্ট সেপ্টেম্বরে যে বর্ষা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জলবায়ুর উপর একটি দেশের অর্থনীতি, সামাজিক জীবন, লোকাচার, খাদ্যের অভ্যাস, পোষাকপরিচ্ছদ, এমনকি শিল্প সংস্কৃতি নির্ভর করে। ঠাণ্ডার দেশ রাশিয়ায় মানুষ মোটা জামাকাপড় পরে। আরব দুনিয়ায় আবার গরমে যাতে শরীর শুকিয়ে না যায় তার জন্য তারা সাদা কাপড়ে নিজেদের আবৃত করে। বাংলা-দেশের জলজ বাতাসে আদুল গা-ই ভালো।

আবহাওয়া তথা জলবায়ু সম্পর্কে মানুষের চিরকাল আগ্রহ আছে। এর কারণ স্পষ্ট। আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে মানুষ কৃষি আবিষ্কার করেছিল। কৃষিজাত পণ্যই তখন মানুষের প্রধান উৎপাদন—তার বেঁচে থাকার পাথেয়। কৃষিকাজ চালাতে প্রয়োজন ভালো উর্বর মাটি, ভালো

বর্ষা অর্থাৎ অনুকূল জলবায়ু। তাই প্রাচীন সভ্যতা নদীর নিকট সমতল-ভূমিতে বিকশিত হয়েছিল। মানুষ নীলনদ, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধুনদের সমতলে আশ্রয় নিয়েছিল। শুধু যে নদীর জল তাদের সাহায্য করেছিল তা নয়—এসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও অত্যাধিক। তাই আবহাওয়া সম্পর্কে আমরা কোনদিনই উদাসীন থাকতে পারিনি। শুধু যে চাষের কাজ তাই নয়, ভালো বর্ষা না হলে খাবার জলে টান পড়ে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কমে, আবহাওয়া উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়, গাছপালা মরে যায়, ভূমিক্ষয় হয়। সময়-মতো বৃষ্টি, সময়মতো শীত না পড়লে প্রকৃতির ভারসাম্যে অস্থিরতা আসে—যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

আবহাওয়ার প্রভাব যে কেবলমাত্র জনজীবনেই পড়ে, তা নয়। পশু-পাখি কীট-পতঙ্গ—সবই এর প্রভাবে প্রভাবিত। শীতকাল আসতে না আসতেই সাইবেরিয়া, মাঞ্চুরিয়ার পাখিরা দল বেঁধে দক্ষিণের গরম দেশে পাড়ি দেয়। ভারতের জলাভূমিতে, নদীতীরে আসে সাইবেরিয়ান সারস, মানস সরোবরের হাঁস। আবার শীত শেষে বসন্তে তারা তাদের বাসস্থানে ফিরে যায়। শীতের শুরুতে ভালুক, সরীসৃপ ভালো করে খেয়েদেয়ে ঘুম দেয়—শীতকালীন ঘুম। শীতের দেশের পোকামাকড় তেমন বিষাক্ত নয়। বিশ ডিগ্রীর নিচে যে মশককূল বাস করে তারা ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে না।

তুষার যুগ

আজ যে দেশে দেশে হরেকরকম আবহাওয়া তা কি চিরদিন এমনি ছিল? বদল কি হয়নি কোনদিন? না, তা নয়। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার আবহাওয়ারও পরিবর্তন হয়েছে। প্রাচীনকালে মহাদেশগুলি এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল, তারপর ধীরে ধীরে তারা পরস্পরের থেকে সরে গেছে, বদল হয়েছে মহাদেশের আবহাওয়া। পৃথিবীর বয়স সাড়ে চারশ কোটি বছর হলেও আবহাওয়ার যে ইতিহাস আমাদের জানা তার বয়স পাঁচ কোটি বছরের বেশি নয়। এই পাঁচ কোটি বছরের ইতিহাস লেখা আছে পাহাড়ের শিলায়, সমুদ্রতলের পাললিক প্রস্তরে, হিমবাহ বরফের স্তূপে। আজ যেখানে রয়েছে সুজলা সুফলা দেশ, একদিন সেখানে ছিল মরুভূমি। আজ যেখানে বনভূমি একদিন তা তলিয়ে ছিল

হিমবাহের গভীরে। প্রাচীনকালে একদিন সাহারার বুকে প্রবাহিত হত নদী। পুরাকালের আবহাওয়া ও আজকের আবহাওয়ায় অনেক ফারাক। এর সব থেকে বড়ো প্রমাণ—আজকের দক্ষিণ ভারতের রুক্ষ প্রান্তরে লেগে
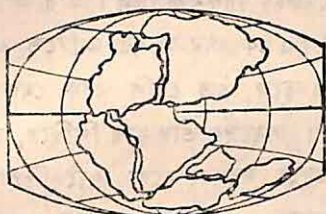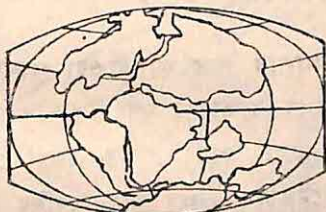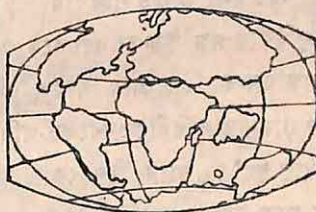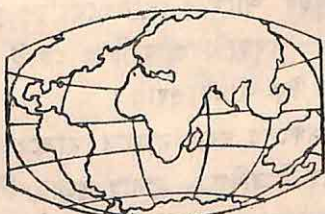
মহাদেশীয় সরণ

আছে অতীতকালের হিমবাহর স্মৃতি। ভূবিজ্ঞানীর তীক্ষ্ণ চোখকে তা ফাঁকি দিতে পারেনি। উড়িষ্যার তালচেরে পাওয়া গেছে হিমবাহর দাগ। এতে প্রমাণ হয় যে দাক্ষিণাত্য একদিন ঐ দক্ষিণ মেরুর লাগোয়া দেশ ছিল।

একদিন যে দাক্ষিণাত্য ঐ দক্ষিণ মেরুর লাগোয়া স্থলভূমি ছিল তার প্রমাণ আছে অজস্র। আণ্টার্কটিকার মাটিতে কয়লার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে যে একদিন সে দেশ বরফমুক্ত ছিল, ছিল গভীর বনে ঢাকা মহাদেশ। গত পাঁচ কোটি বছরের বেশির ভাগ সময় ভূমেরুদ্বয় বরফমুক্ত ছিল। আর আজ যে মেরুদেশে বরফের প্রাচুর্য—তাতে প্রমাণ হল যে এখন আমরা আদতে একটি 'তুষার যুগে' বাস করছি। তুষার যুগের তুঙ্গে এত বেশি বরফ মেরুদেশে আটকে যায় যে সমুদ্রের জলে টান পড়ে। সমুদ্রের তীর যায় পিছিয়ে, ডাঙ্গা জমি বেড়ে ওঠে। সমুদ্রতীর থেকে বহুদূরে জলের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ম্যামথের দাঁতের ফসিল পাওয়া গেছে। এতেই প্রমাণ হল—একদিন এসব অঞ্চলে ডাঙ্গা ছিল, পৃথিবীতে চলছিল তুষার যুগের চরম অবস্থা। ডাইনোসরদের অবলুপ্তির মূলে আছে তুষার যুগ—এমন একটি মতবাদ বিজ্ঞানীদের মধ্যে চালু আছে।

পৃথিবীর বুকে গাছপালা প্রাণী আসার পরে আবহাওয়া পালটেছে বহুবার। এই আবহাওয়া বদলের জন্য যে বাতাসের মূল উপাদান দায়ী তা নয়, বরং বলা উচিত পৃথিবীর গড় উষ্ণতা দায়ী। গত একশ' কোটি বছরে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বদলেছে অনেকবার। এর মধ্যে বেশির ভাগ সময় গড় উষ্ণতা ছিল প্রায় বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পঁচিশ কোটি বছর পর পর চারবার পৃথিবীতেবরফের পরিমাণ খুব বেড়েছে—এরই নাম 'হিমযুগ' বা 'তুষার যুগ'। প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে (পেলিওজোয়িক যুগে) পৃথিবী জুড়ে বরফের আধিক্য ছিল, এই অবস্থাটা প্রায় চার কোটি বছর চলেছিল। তারপর এলো অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়া।

তুষার যুগ যখন তুঙ্গে তখন মেরু অঞ্চলের বরফ নামতে নামতে প্রায় ইউরোপ-আমেরিকার পুরোপুরিটা ছেয়ে দিয়েছিল। তুষার যুগের পিছনে কারণ কি তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা একমত হতে পারেননি। একদল বলেন, প্রায় চব্বিশ হাজার বছর পর পর পৃথিবীর অক্ষরেখা দিক বদল করে। এজন্য সূর্য থেকে আগত তাপের হেরফের হয়, যার ফলে আসে হিমবাহ। এক বছর মেরু অঞ্চলে কিছুটা বেশি বরফ জমলে পরের বছর ঐ বরফই বেশি করে সূর্যতাপ প্রতিফলিত করে দেবে—তাতে বরফের পরিমাণ বাড়বে, পরের বছর ঐ একই কারণে বরফ আরো বাড়বে। এভাবে পৌনঃপুনিক পদ্ধতিতে নেমে আসবে এক তুষার যুগ।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। আমরা কিন্তু এখনো একটা তুষার যুগের শেষ প্রান্তে বাস করছি। এখনো উত্তর মেরু, গ্রীণল্যাণ্ড, আলাস্কা, আন্টার্কটিকাতে অনেক অনেক বরফ জমে আছে। আজ পৃথিবীতে গড় উষ্ণতা মাত্র ১৪° সেন্টিগ্রেড। মানুষের কর্মযজ্ঞ, কলকারখানার প্রসারের সাথে সাথে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, ধুলো বাড়ছে। এরা যেমন এক-

প্রাচীন পৃথিবী
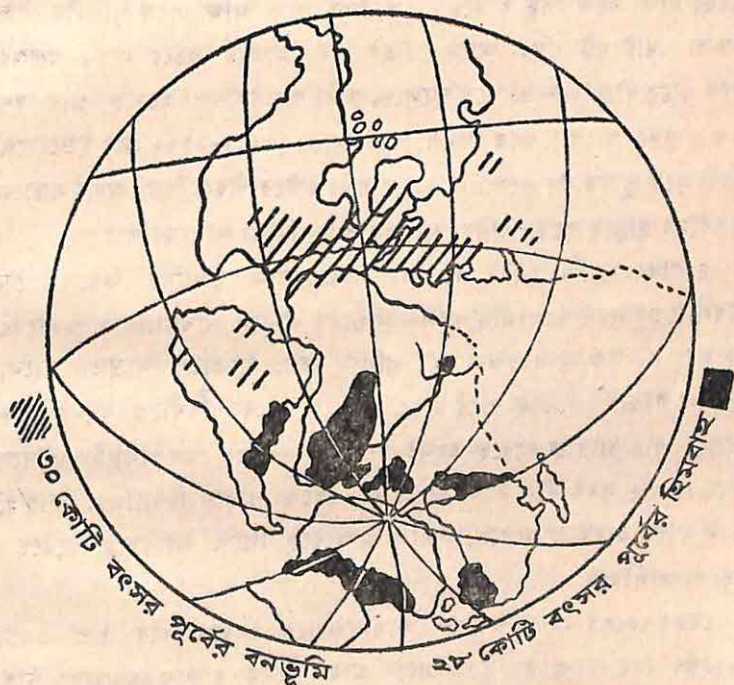
দিকে উষ্ণতা বাড়াতে সাহায্য করছে, তেমনি অন্যদিকে কমাবার কাজে হাত লাগিয়েছে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড উষ্ণতা বাড়াচ্ছে, ধুলো সূর্যতাপ আসার পথে বাধা দিয়ে উষ্ণতা কমাচ্ছে। তার মানে, বায়ুদূষণের জন্য শেষ পর্যন্ত বাতাসের গড় উষ্ণতার তেমন কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তবে কোন কোন স্থানে বছর বিশেষে বৃষ্টিপাত কম বেশি হচ্ছে, তাতে স্থানীয় আবহাওয়া কিছুটা বদলাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে যদি গড় উষ্ণতা বেড়ে যায় তবে মেরুর দেশের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রতলের উচ্চতা বাড়িয়ে দেবে, সমুদ্রতীরবর্তী নিচু স্থান, সমুদ্রের কোলের শহরগুলি জলমগ্ন হবে। আর

যদি পৃথিবীর গড় উষ্ণতা কমে তাহলে মেরুর দেশে, গ্রীণল্যাণ্ডে বরফ যাবে বেড়ে, সমুদ্রের জলে টান পড়বে, সমুদ্রের তীরভূমি প্রসারিত হয়ে মানুষের বাসযোগ্য সমতলভূমি বাড়বে নিশ্চয়। শেষ পর্যন্ত যে কি হবে তা এখনো হলফ করে বলা যাচ্ছে না।

প্রায় দশ হাজার বছর আগে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা থেকে শেষ-বারের মতো বরফ পিছু হঠেছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর গড় উষ্ণতা মোটামুটি স্থির আছে। এই দশ হাজার বছরে মানুষ বন্যস্তর থেকে ধীরে ধীরে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, কৃষি আবিষ্কারও হয়েছে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। প্রায় তিনশ' বছর আগে (১৫৫০-১৭৭০ খ্রীঃ) ইউরোপে একটি ক্ষুদে তুষার যুগ এসেছিল। সে সময় ইউরোপীয়রা উষ্ণ দেশের সন্ধানে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে, এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয়।

ভাইকিং অভিযানের গল্প বা অগ্রসরমান তুষারের কবলে পড়ে গ্রীণল্যাণ্ডের নরর্স কলোনীর ধ্বংস—মানুষের জীবনে আবহাওয়ার প্রভাবের উদাহরণ। উষ্ণ আবহাওয়া বরফ গলিয়ে দেয়, বাতাসে আর্দ্রতা আনে, বৃষ্টিপাত বাড়ায়। তাই বারে বারে দেখা গেছে যে পৃথিবীতে যখনই উষ্ণ আবহাওয়ার প্রাধান্য হয়েছে তখনই মানুষের সভ্যতা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। এই সময় নীল নদের উপতাকা থেকে পারস্য উপসাগর, ভারত, চীনে মানুষ চাষবাস করেছে, সমাজবদ্ধ হয়েছে, লিপি আবিষ্কার করেছে। সভ্যতা এগিয়েছে।

মেরুর দেশের বরফ কিভাবে আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তার একটা উদাহরণ দিই। প্রতি বছর গড়ে প্রায় পনের হাজার বরফের চাঁই গ্রীণল্যাণ্ড থেকে ভেঙে সমুদ্রে পড়ে। বিশালাকায় বরফের পাহাড়গুলি দক্ষিণ উষ্ণ সাগরের দিকে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। নামার সময় বেশ কিছু গলে গেলেও শেষ পর্যন্ত শ'চারেক হিমশৈল উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে হাজির হয়। এর প্রভাবে পূর্ব আমেরিকায় হিমশীতলতা, বরফপাত, তুষারঝড় অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়—আবহাওয়ায় ভীষণভাবে অদলবদল হয়।

এজন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, মেরুদেশের বরফই পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। যতদিন পর্যন্ত বরফের পাহাড় বোঝাই মেরু দুটি থাকবে ততদিন গড় আবহাওয়ার পরিবর্তনের তেমন কোন আশা বা আশঙ্কা নেই।

খর বায়ু বয় বেগে

নীল নভোতলে শান্ত পৃথিবীতে এই যে আমাদের বাস তা কত সহজ। মাছ যেমন অবলীলায় জলে সাঁতার দেয় আমরা তেমনি স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকি বাতাসের সাগরে। মাথার উপর পর্বতপ্রমাণ বাতাসের বোঝা বইতে হয় সবাইকে—মাটি গাছ পাথর পশুপ্রাণী সবাই। বাতাসের ওজন মোটেই কম নয়। কিন্তু এত যে ভার আমরা তা বুঝি না। বাতাসের চাপ কেবলমাত্র শীর্ষদেশে নয়, সব দিক দিয়ে সামনে পাশে ভিতরে বাতাস সমান চাপ দিচ্ছে। তাই শেষ পর্যন্ত বাতাসের চাপের প্রতিক্রিয়াটা বাস্তবায়িত হয় না।

বাতাসের যে চাপ আছে তার একটা প্রমাণ দিই। একটা বড় কাচের গ্লাসে কানায় কানায় জল ভর্তি করে তার উপর একটা পোস্টকার্ড ঢাকা দিলাম। পোস্টকার্ডটা হাতে চেপে সাবধানে গ্লাসটা উপুড় করে হাত সরিয়ে নিলাম। কি দেখবো? উলটানো গ্লাসের জল এক ফোঁটাও পড়লো না। কেন এমন হল? কারণ, পোস্টকার্ডের উপর বাতাস কেবল-মাত্র নিচ থেকে চাপ দিচ্ছে, বিপরীতদিকে শুধু জল থাকায় সেদিকে কোন বায়ুচাপ থাকছে না। একপার্শ্বিক বায়ুচাপের জন্য জল গ্লাস থেকে আদৌ পড়লো না।

বাতাসের চাপের দরুন কিছু কাজ বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে শেষ করা যায়। মাটির অতল থেকে পাম্পে জল তোলা, পিচকারীতে রঙ ছেটানো—সবার মূলে ঐ বায়ুচাপ।

পৃথিবীর উপর দিকে প্রায় তিনশ' কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাস বিস্তৃত। মাটির উপর প্রতি বর্গসেন্টিমিটার জমি বাতাসের যে ওজন অনুভব করে তার নাম বায়ুচাপ। সাধারণ বায়ুচাপ প্রায় এক কিলোগ্রাম ওজনের সমান। পর পর কয়েকটা বই সাজানো থাকলে যেমন তলার বইতে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে, উপরের বই কম চাপ অনুভব করে, তেমনি সমুদ্রতলে বাতাসের চাপ সব থেকে বেশি, মাটি ছাড়িয়ে উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুচাপ কমে যায়। চাপ কমে গেলে ঘন বাতাস পাতলা হবে। যেখানে সমুদ্রতলে এক লিটার বাতাসের ওজন ১·৩ গ্রাম, সেখানে এভারেস্টের চূড়ায় এক লিটার বায়ুর ওজন মাত্র ০·৪ গ্রাম। এতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, উঁচু তলার বাতাস কেমন হালকা ফুরফুরে।

এই যে বললাম, বাতাসের চাপ এক কিলোগ্রামের মতো—তা বুঝলাম কি করে? মাপলাম কি করে? বাতাসের চাপ মাপার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন ইভানগেলিস্তা টরেসেলী। গ্যালিলিওর ছাত্র টরেসেলী ১৬৪৩ সালে একটা এক মিটার লম্বা এক মুখ বন্ধ, এক মুখ খোলা কাচের নলে পারদ ভর্তি করে অন্য একটি পারদের বাটিতে উপুড় করে ধরেন। দেখা গেল, পারদ এক মিটার থেকে কমে প্রায় ৭৬ সেন্টিমিটারে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাটা বুঝিয়ে দিলেন ব্লেইসে পাস্কাল। তিনি বললেন, বাতাস খোলা বাটিতে রাখা পারদের উপর চাপ দেয়, ৭৬ সেন্টিমিটার উঁচু পারদ স্তম্ভের ওজন এই চাপের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

টরেসেলির পরীক্ষার ভেতরের ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ফরটিনের ব্যারোমিটার বানানো হল। বাতাসের চাপ যত বাড়ে ব্যারোমিটারের পারদ তত বেড়ে যায়। স্বাভাবিক বায়ুচাপ বলতে আমরা ৭৬ সেন্টিমিটার উঁচু পারদস্তম্ভের ওজন বুঝি। টরেসেলির পরীক্ষা অনুসরণ করে 'কিউ ব্যারোমিটার' (Kew barometer) বলে আর এক রকমের ব্যারোমিটার বানানো হয়েছিল। টরেসেলির পরীক্ষা অনুসরণ করে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট হুক 'চক্র ব্যারোমিটার' বানিয়েছিলেন। পারদের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে একটি কাঁটা চক্রের উপর ঘুরপাক খায়। কাঁটার অবস্থান দেখে বায়ুচাপ কত তা বলা সম্ভব।

বাতাসের চাপ মাপার জন্য অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার বলে এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আকাশে যত উঁচুতে ওঠা যায় তত বায়ুচাপ কমে, সেজন্য অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটারে বাতাসের চাপের বদলে সরাসরি উচ্চতা মাপা হয়। তাই এর আর এক নাম 'অল্টিমিটার'। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বিজ্ঞানী লুসিয়াস ভিডি অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন। 'অ্যানেরয়েড' কথাটির অর্থ 'তরল ব্যতীত'। অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার ফরটিন বা কিউ ব্যারোমিটারের মতো বায়ুচাপ নিখুঁতভাবে মাপতে না পারলেও এর ব্যবহারে সুবিধা আছে। পর্বত আরোহীরা, বৈমানিকরা অল্টিমিটার ব্যবহার করেন।

অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটারের কর্মধারা বেশ সহজ। কিছুটা বাতাস পাতলা ধাতব আধারের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়। বায়ুচাপ পরিবর্তনের সাথে সাথে বন্ধ আধারের আয়তন বাড়ে কমে, ধাতব পাতের সঙ্গে লাগোয়া

একটা কাঁটা ঘুরে ফিরে অংশাঙ্কিত স্কেলের উপর দিয়ে গিয়ে বায়ুর চাপকে নির্দেশ করে।
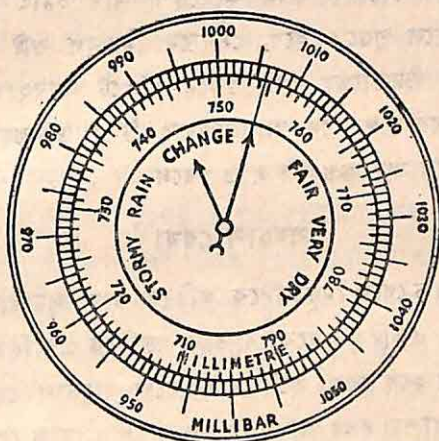
অ্যানেরয়েড ব্যারোমিটার

আর ঐ কাঁটার সঙ্গে লাগোয়া কোন কলম যদি ঘুরন্ত কাগজের উপর
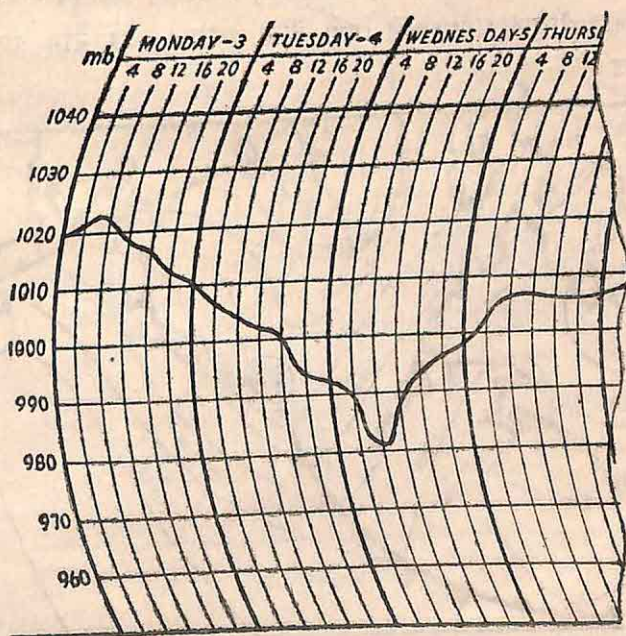
ব্যারোগ্রাম

দিয়ে টানা হয় তাহলে বায়ুচাপের ধারাবাহিক পরিবর্তনের রেখা পাব।

এর নাম 'ব্যারোগ্রাম'। ব্যারোগ্রামের উপর নজর দিলেই বুঝতে পারবো, কবে কখন বায়ুচাপ বেড়েছে, কখন কমেছে। যদি হঠাৎ ব্যারোমিটারের উচ্চতা কমে তাহলে বুঝতে হবে, সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে, ঝোড়ো বাতাস বইবে। উচ্চচাপের অর্থ—শুকনো খটখটে আবহাওয়া। ব্যারোমিটার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার উপর ভবিষ্যদ্বাণী শুরু হল, আবহাওয়া বিজ্ঞান দ্রুত অগ্রগতি লাভ করলো।

সমচাপ রেখা

জল যেমন উঁচু থেকে নিচুর দিকে গড়িয়ে যায় অনায়াসে বায়ুচাপের পার্থক্যে তেমনি একদিক থেকে বাতাস অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ বায়ুচলাচল কেমন হবে বুঝতে হলে দেশের মধ্যে বায়ুচাপ কেমন তা জানা দরকার। আবহাওয়া দপ্তর আমাদের জন্য বায়ুচাপ মেপে দেয়।

খবরের কাগজে যেখানে আবহাওয়া সংবাদ লেখা থাকে সেখানে আমরা একটা ছবি দেখি (Synoptic chart)। যেমন, ভারতের মানচিত্রের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা কতগুলি রেখা টানা আছে। এর নাম বায়ুচাপ-লেখচিত্র।
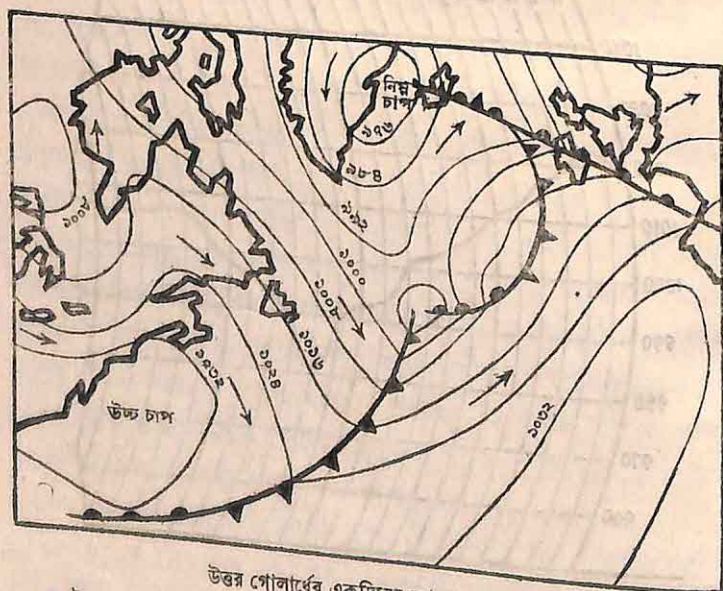
উত্তর গোলার্ধের একদিনের আবহাওয়া-চার্ট

মাটি থেকে উচ্চতা বাড়ালে বায়ুচাপ কমে, বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি

থাকলেও বায়ুচাপ কমে। এর কারণ, জলীয় বাষ্প বাতাসের অন্যান্য উপাদানের চেয়ে হালকা। উষ্ণতা বাড়লেও বায়ুচাপ কমে। এজন্য দেশের নানান স্থানে নানান বায়ুচাপ হতে পারে। এখন, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া বায়ুচাপগুলি শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা ও সমুদ্রতল উচ্চতার চাপে পরিবর্তিত করে, অর্থাৎ সাধারণ উষ্ণতায় ও চাপে (**Normal Temperature and Pressure**) কতো হতে পারে তা হিসাব করে নিয়ে মানচিত্রে আঁকা হয়। আমরা আগেই বলেছি যে ৭৬ সেন্টিমিটার উঁচু পারদস্তম্ভের ওজন প্রমাণ বায়ুচাপের সমান। এই প্রমাণ বায়ুচাপকে এক বার বা এক হাজার মিলিবার বায়ুচাপ বলে। কোন দেশের মধ্যে যে সব স্থানের বায়ুচাপ সমান তাদের যোগ করে একাধিক রেখা টানা হয়। রেখাগুলির পাশে বায়ুচাপের মান (মিলিবারে) লেখা থাকে। সাধারণত দুই বা তিন মিলিবারের তফাতে
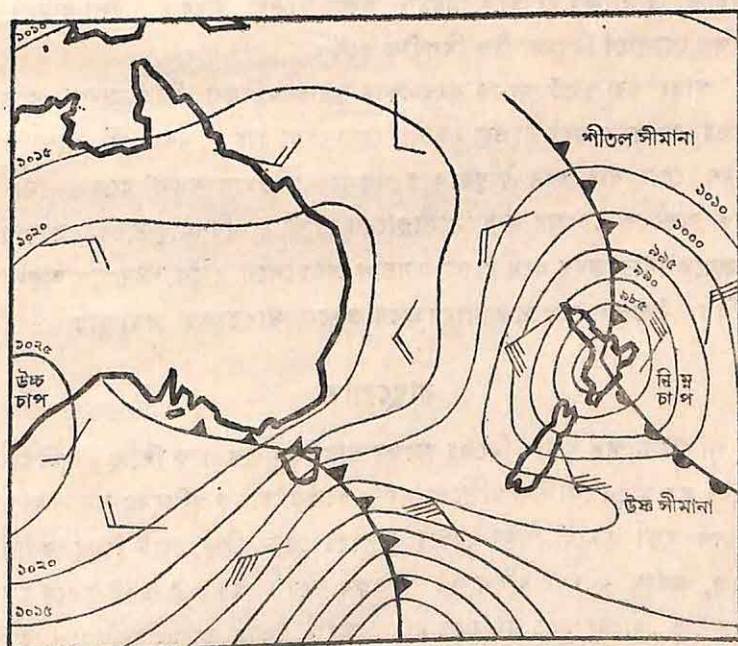
দক্ষিণ গোলার্ধের একদিনের আবহাওয়া-চার্ট

রেখাগুলি টানা হয়। এক একটি রেখাকে 'সমপ্রেষ রেখা' বা 'সমচাপ রেখা' (Isobar) বলি।

বাতাস সাধারণত উচ্চচাপ রেখা থেকে নিম্নচাপ রেখার দিকে প্রবাহিত হয়। ঘন ঘন সমচাপ রেখা থাকার অর্থ—অল্প ব্যবধানে বায়ুচাপের ব্যাপক পরিবর্তন—অর্থাৎ জোরে বাতাস বইবে। আর অনেকটা ফাঁক রেখে সমচাপ রেখা থাকার অর্থ—মৃদুমন্দ বাতাসের গতি। দু'টি স্থানের বায়ুচাপের পার্থক্যকে স্থানদূরত্ব দিয়ে ভাগ করলে বায়ুচাপ নতি (Barometric Gradient) পাওয়া যায়। প্রবাহিত বায়ুর গতি ও শক্তি এই বায়ুচাপ নতির সঙ্গে সমানুপাতিক হারে পরিবর্তিত হয়।

বাতাসের গতির দিক বের করতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বাই ব্যালটের নিয়ম' (Buys Ballot's Law) আবিষ্কৃত হয়। এই নিয়ম অনুসারে, উচ্চচাপ রেখা থেকে তির্যকভাবে নিম্নচাপ রেখার দিকে বায়ু প্রবাহিত হবে, উত্তর গোলার্ধে কোন ব্যক্তি যদি প্রবাহিত বাতাসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ায় তাহলে ঐ ব্যক্তির বাঁ দিকে নিম্নচাপ অঞ্চল পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ গোলার্ধে নিয়মটা ঠিক বিপরীত হবে।

আবহাওয়া চার্টে অনেক সময় কোন বৃত্তাকার অঞ্চল ঘিরে ক্রমশ বেড়ে যাওয়া বা ক্রমশ কমে যাওয়া সমচাপ রেখা দেখা যায়। যখন এই রেখাগুলি ক্রমশ বেড়ে যায় তখন ঐ বৃত্তাকার অঞ্চলকে 'নিম্নচাপ অঞ্চল' বলে। নিম্নচাপ অঞ্চলের কেন্দ্রের নাম 'সাইক্লোনের চোখ'। বিপরীতভাবে, বৃত্তাকার অঞ্চলকে ঘিরে ক্রমশ কমে যাওয়া সমচাপ রেখা পেলে তাকে 'উচ্চচাপ অঞ্চল' বলি। উচ্চচাপ অঞ্চলে সাধারণভাবে শুকনো আবহাওয়া দেখা যায়।

বায়ুস্রোত

পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের অক্ষের চারদিকে এক পাক দিচ্ছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের সব স্থানে কৌণিক গতিবেগ সমান হলেও রৈখিক গতিবেগ সমান নয়। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ে বিষুব রেখার উপরের কোন বিন্দু, মোট বিষুব রেখার দূরত্ব, অর্থাৎ ২৫০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু ঐ একই সময়ে দুই মেরুবিন্দু মোটেই নড়ে না, চড়ে না। অর্থাৎ, কোন স্থানের অক্ষাংশ যত বাড়ে তত তার রৈখিক গতিবেগ কমে যায়। যেমন কলম্বো শহর যেখানে ঘণ্টায় ১০০০ মাইল যায়, সেখানে লণ্ডন শহর যায় মাত্র ৬৫০ মাইল। পৃথিবীপৃষ্ঠের গতিবেগের এই পার্থক্য শেষ পর্যন্ত বাতাসের গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কি ভাবে ?

পৃথিবীর গায়ে লাগানো বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সাথে সাথে আবর্তিত হয়। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ হ্যাডলে নামে এক ইংরাজ আইনজীবী পৃথিবীর প্রধান প্রধান বায়ুস্রোতগুলি আবিষ্কার করেছিলেন। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারা বছরই কম বেশি সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, এদিকে সূর্যতাপের পরিমাণও বেশি। মজার কথা, ঠিক বিষুবরেখার উপর সূর্য সারা বছরে যত তাপ দেয়, তার থেকে ঢের বেশি দেয় কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি সন্নিহিত এলাকায়। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার পথের বৈশিষ্ট্যের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। বিষুবরেখার কাছে সূর্য এক বছরের মধ্যে ত্রিশ দিন লম্বভাবে কিরণ দেয়, কিন্তু ক্রান্তি রেখার কাছাকাছি সূর্য এক বছরে প্রায় আশি দিন লম্বভাবে কিরণ দেয়। যাই হোক, অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাতাস গরমে প্রসারিত হয়। প্রসারিত বায়ু হালকা (কম ঘনত্ব), তা উপরের দিকে উঠে যায়।
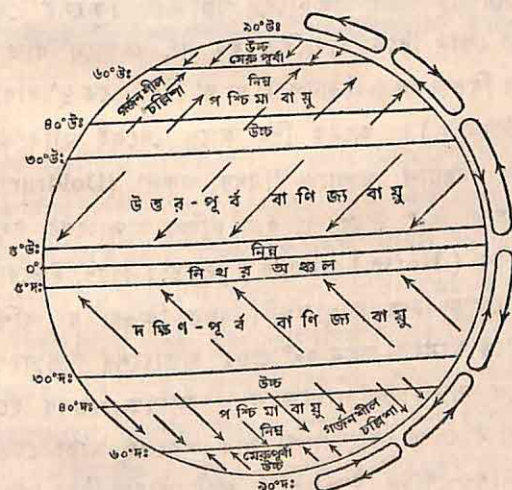
প্রধান বায়ুপ্রবাহ ও কোরিওলিস ক্রিয়া

এভাবে বিষুব রেখার চারপাশে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। বাতাস বিষুব রেখার থেকে উঠে আকাশের উঁচু পথ ধরে ৩০° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত গিয়ে নেমে পড়ে। কারণ ৩০° পর্যন্ত আসতে আসতে বাতাস এতো ভারী হয়ে যায় যে তার না নেমে উপায় থাকে না। ওদিকে আবার মেরু অঞ্চল দু'টি শীতল বলে তার উপর ভারী নিথর বাতাস নেমে আসে। কোথা

থেকে? প্রায় ৬০° অক্ষাংশ থেকে বাতাস উঠে মাটি থেকে কয়েক কিলো-মিটারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেরু অঞ্চলে নেমে আসে। তাই, শুধু যে বিষুবরেখার চারদিকে নিম্নচাপ অঞ্চল গঠিত হয়, তা নয়। ঠিক এই রকম আরো দু'টি নিম্নচাপ অঞ্চল, একটি ৬০° উত্তর ও অন্যটি ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশে জন্ম নেয়। ৬০° অক্ষাংশ থেকে গরম বাতাস উঠে দু'টি ধারায় বিভক্ত হয় —একটি ধারা মেরুর দিকে এবং অন্যটি ৩০° অক্ষাংশ পর্যন্ত আসে, তারপর তারা নীচে নামে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ৩০° উত্তর, ৩০° দক্ষিণ, উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুতে উচ্চ চাপ এবং বিষুবরেখা, ৬০° উত্তর, ৬০° দক্ষিণে নিম্নচাপের উদয় হয়।

আমরা বুঝতে পারছি, কোথাও অত্যাধিক গরম হলে বাতাস হালকা হয়ে উপরে উঠে সেখানে নিম্নচাপ তৈরি করে। আবার ভারী ঠাণ্ডা বাতাস যেখানে নেমে আসে তার প্রকৃতি হয় উচ্চচাপের প্রকৃতি। ঠিক সেই সেই অঞ্চলের বাতাস বিশেষ কোন দিকে প্রবাহিত হয় না, যেখানে বাতাস উপরে উঠে দু'টি ধারায় বিভক্ত হয় (নিম্নচাপ), বা দু' দিক থেকে দু' ধারার বাতাস এসে নামে (উচ্চচাপ)। অনেক দিন আগে থেকেই নাবিকেরা বিষুবরেখার চারদিকের নিম্নচাপ অঞ্চলকে 'নিথর অঞ্চল' (Doldrums) বলতো। সে সময় তারা ৩০° উত্তর বা ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের সমুদ্র অঞ্চলকে 'ঘোটক অক্ষাংশ' (Horse Latitude) বলতো। কারণ, ইউরোপ থেকে জাহাজ বোঝাই ঘোড়া নিয়ে জাহাজগুলি যখন কিউবা বা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে আসতো তখন ৩০° উত্তর অক্ষাংশের উচ্চচাপের প্রভাবে জাহাজের পালে আর হাওয়া লাগতো না। জাহাজ অগ্রসর হতে পারতো না, তৃষ্ণার জল না পেয়ে ঘোড়াগুলো মাঝ সমুদ্রেই মারা যেত। তাই ওই অঞ্চলের নাম—ঘোটক অক্ষাংশ। একই কারণে বিষুব রেখার আশেপাশে নিথর সমুদ্র, নিথর বায়ুমণ্ডল দেখা যায়।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। বাতাসের স্রোতগুলি, অক্ষাংশ রেখার সঙ্গে লম্বভাবে প্রবাহিত হয় না। উনিশ শতকে ফরাসী গণিতবিদ গাসপার্ড গুস্তাভ দ্যে কোরিওলিস পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে বাতাসের প্রবাহ-দিকের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। আমরা জানি যে, কোন ঘুরন্ত চাকার উপর দিয়ে ব্যাসার্ধ বরাবর সোজাভাবে কোন রেখা টানার চেষ্টা করলে তা ডাইনে অথবা বাঁয়ে ঘুরে যায়। চাকাটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত

দিকে আবর্তন করলে ঐ রেখা যে দিকে যাবে, চাকা বিপরীত দিকে ঘুরলে রেখাও বিপরীত দিকে ঘুরে যাবে। কোরিওলিসের এই তত্ত্বকে সাধারণ-

নিরক্ষীয় নিথর অঞ্চল
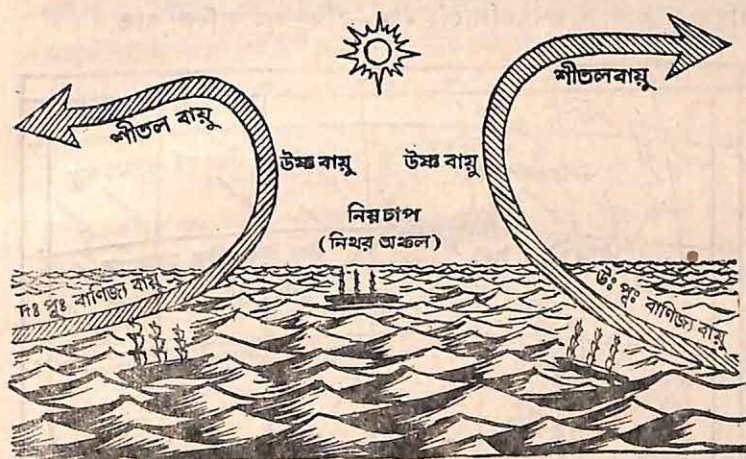
ভাবে 'কোরিওলিস ক্রিয়া' (Coriolis Effect) বলে। কোরিওলিস ক্রিয়ার জন্য উত্তর গোলার্ধে বাতাস পশ্চিম থেকে পূবে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে পূব থেকে পশ্চিমে বেঁকে যায়। পৃথিবীর পাঁচটি মহাসাগরে যে সমুদ্র-স্রোত প্রবাহিত হয় তার গতিবিধিও কোরিওলিস ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

মাটি থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উঁচু দিয়ে বাতাসের স্রোতগুলি প্রবাহিত হয়। উঁচু দিয়ে যাবার পর উচ্চচাপ অঞ্চলে তা মাটির কাছে নেমে আসে, তারপর মাটির সামান্য উপর দিকে বিপরীত দিকে বাতাস বয়ে যায়। ভিন্নমুখী এই দুই বায়ুস্রোত একটি চক্রের অংশ। দুই মেরু থেকে মাটির উপর দিয়ে 'মেরুপূর্বা' (Polar Esterlies) ৬০° অক্ষাংশ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। কোরিওলিসের নিয়ম অনুযায়ী মেরুপূর্বাদ্বয় পূব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। ৩০° থেকে ৬০° পর্যন্ত মাটি ধরে 'পশ্চিমা' (Westerlies) প্রবাহিত হয়। এই বাতাসের দিক পশ্চিম থেকে পূবে। ৪০° থেকে সারাবছরই প্রায় দক্ষিণ-পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিকে তীব্র বায়ু প্রবাহিত হয়। একে কখনো কখনো 'গর্জনশীল চল্লিশা' (Roaring Forties) বলা হয়। ৩০° অক্ষাংশ থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত যে বাতাস প্রবাহিত হয়

তার নাম 'বাণিজ্য বাতাস' (Trade Wind)। বাণিজ্য বাতাস উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসে। উত্তর গোলার্ধে এর নাম—উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বাতাস, দক্ষিণ গোলার্ধের নাম—দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বাতাস।
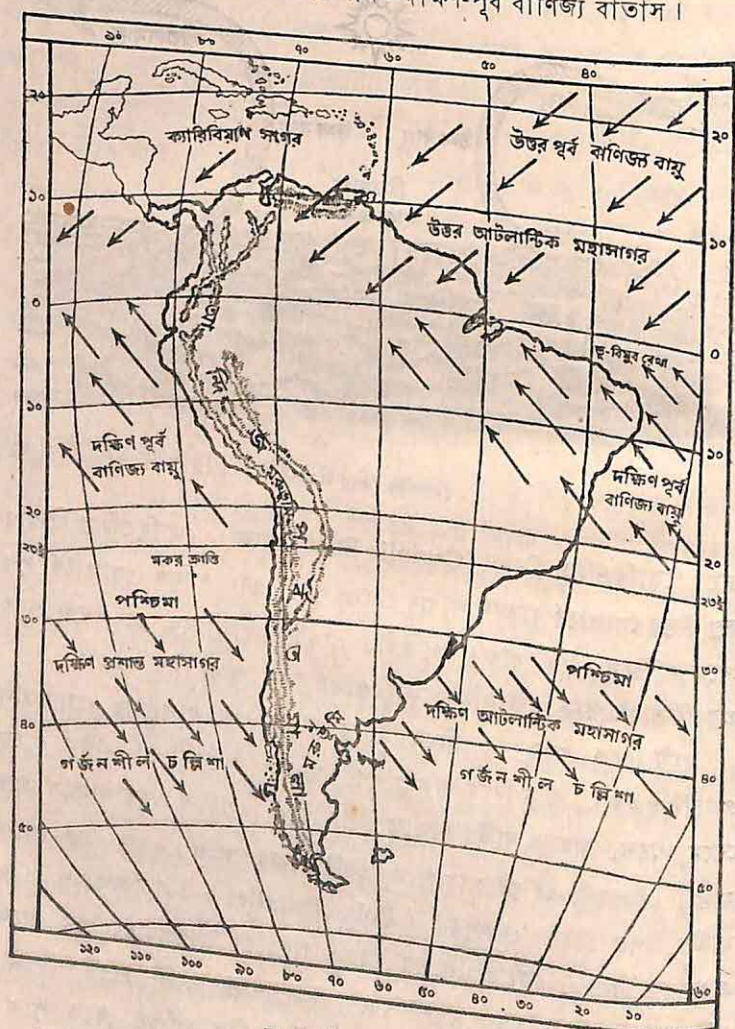
দঃ আমেরিকার বায়ুপ্রবাহ

বাতাসের প্রভাবে একটি মহাদেশের জলবায়ু কিভাবে প্রভাবিত হয় তা দক্ষিণ আমেরিকার দিকে তাকালে বুঝি। ব্রাজিলের মালভূমিতে (বিষুব-রেখা অঞ্চল) প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কারণ উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বাতাস আটলান্টিক

থেকে জোলো হাওয়া টেনে আনে, আবার দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বাতাসও দক্ষিণ আটলান্টিক থেকে বাতাস আনে। ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের নীচে, গর্জনশীল চল্লিশার প্রভাবে আন্দিজের পশ্চিমে বৃষ্টি হলেও, পূর্ব দিক, অর্থাৎ আর্জেন্টিনায় একেবারে বৃষ্টি হয় না। চল্লিশার দিক পশ্চিম থেকে পূবে বলে সমুদ্রতীরবর্তী হয়েও দক্ষিণ আর্জেন্টিনা মরুভূমি হয়ে গেছে। আবার দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বাতাস পূব থেকে আসে বলে, আন্দিজের পূবে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু চিলির উত্তর প্রায় বৃষ্টিহীন—দেখা দিয়েছে আতাকামা মরুভূমি। মজার কথা, লম্বাটে দেশ চিলি পুরোটাই প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে, কিন্তু বাতাসের দিক বদলের জন্য দক্ষিণ চিলি বৃষ্টিপূর্ণ আর উত্তর চিলি বৃষ্টিহীন।

বাতাস কোন্ দিকে বইছে তা 'বায়ু মোরগ' দেখিয়ে দেয়। ধাতু বা কাঠের তৈরি মোরগ এমনভাবে রাখা হয় যাতে বাতাসের তোড়ে সেটা বন্-বন্ করে ঘুরতে পারে। ঘুরতে ঘুরতে যে দিক থেকে বাতাস বইছে সে দিকে মুখ করে মোরগটা দাঁড়িয়ে পড়ে। কখনো মোরগের বদলে কাঠের বা ধাতুর তীর দিয়ে বাতাসের গতিমুখ দেখানো হয়। প্রবাহিত বাতাসের দিক অনুযায়ী বাতাসের প্রধানত দু'টি ভাগ আছে—মহাদেশীয় (Continental) ও সামুদ্রিক (Maritime)। মহাদেশের উপর থেকে ভেসে আসা বাতাসের নাম 'মহাদেশীয়' আর সমুদ্রের উপর দিয়ে যে বাতাস আসে তার নাম 'সামুদ্রিক' বাতাস। ইউরোপের মাটিতে আমরা এরকম পাঁচটি বাতাসের দেখা পাই। এরা উত্তর-মেরুদেশীয় (Arctic), সামুদ্রিক-মেরুদেশীয় (Maritime Polar), মহাদেশ-মেরুদেশীয় (Continental-Polar), উষ্ণ-সামুদ্রিক (Maritime Tropical) এবং উষ্ণ-মহাদেশীয় (Continental Tropical)। উত্তর-মেরুদেশীয় বাতাস সর্বদা শীতল, শীতকালে এই বাতাস ভীষণ রকম বরফপাত ঘটায়। আইসল্যাণ্ডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে এই বাতাস প্রচুর জলকণা বয়ে আনে, তাতে বরফপাত হয়; কিন্তু রাশিয়ার উপর দিয়ে ঘুরে এলে এই বাতাস শুকনো থাকে, শীতলতার তীব্রতা বাড়ে। সামুদ্রিক-মেরুদেশীয় বাতাস শীতল, বৃষ্টিপাত ঘটায়। সাহারা থেকে উষ্ণ-মহাদেশীয় বাতাস আসে, তখন ইউরোপে বেশ গরম পড়ে। উষ্ণ-সামুদ্রিক বাতাস শীতকালে শীতল হলেও গরমকালে এই বাতাস আর্দ্র, ভ্যাপসা, সমুদ্রতীরে তা বেশ কুয়াশা তৈরি করে।

তখন ১৯৪৪ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। একটি আমেরিকান B29 বোমারু বিমান উর্ধ্বাকাশ দিয়ে চলেছে জাপানের দিকে। শত্রুপক্ষের চোখকে ফাঁকি দেবার জন্য পাইলট বিমানটিকে মাটি থেকে প্রায় ছয় মাইল
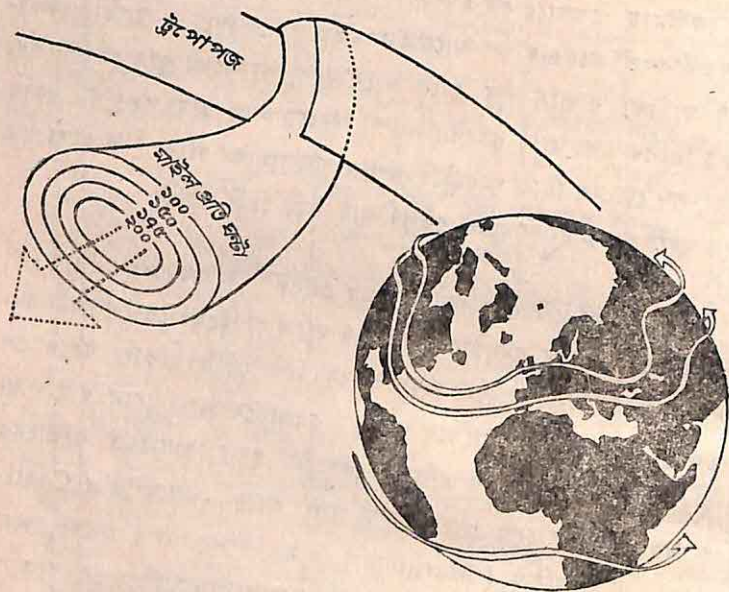
উর্ধ্বাকাশের বায়ুপ্রবাহ

উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চললেন। কিন্তু একি! ঘণ্টায় সাড়ে তিনশ' মাইল গতিবেগে ওড়া সত্ত্বেও বিমান তো বিশেষ এগোচ্ছে না। বৈমানিক দেখলেন, ঠিক বিপরীত দিকে ঐ একই গতিবেগে একটি বাতাসের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সেদিন এই বায়ুস্রোত আবিষ্কৃত হল। এর আগে এই বাতাসের কোন হদিশ জানা ছিল না। বিজ্ঞানীরা কৌতূহলী হলেন। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝে এই বায়ু প্রবাহিত হয়। একটি নয়, মূলত দু'টি বায়ুস্রোত আছে। একটি বায়ুস্রোত উত্তর গোলার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভূমধ্যসাগর, উত্তর চীন বরাবর পশ্চিম থেকে পূবে প্রবাহিত হয়, অন্যটি দক্ষিণ গোলার্ধে নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

আজকালকার জেট বিমানের বৈমানিকরা খুব চালাক হয়ে গেছেন।

দ্রুতবেগে জেট চালাবার জন্য তাঁরা বিমানকে তুলে সরাসরি ঐ বায়ুপ্রবাহের মধ্যে চালিয়ে দেন। তারপর হাওয়ার তোড়ে পালতোলা নৌকা যেমন এগিয়ে যায়,তেমনি জেট বিমান তীব্র বেগে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়।

উর্ধ্বাকাশের এই বায়ুস্রোত নিম্ন আকাশে প্রভাব বিস্তার করে। আবহাওয়াবিদরা মনে করেন যে নিম্ন আকাশের নিম্নচাপ ইত্যাদি গঠনে উর্ধ্বাকাশের বায়ুস্রোতের অবদান আছে।

কালবৈশাখী-টরনেডো-সাইক্লোন

মৃদুমন্দ বাতাস কার না ভালো লাগে। বিশেষত গরমকালের সন্ধ্যাবেলা যখন দক্ষিণ দিক থেকে ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসে, সারাদিনের গরমের ক্লান্তি এক নিমেষে কোথায় যে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই বাতাস যে কি ভয়ানক রুদ্ররূপ ধরতে পারে, তা কি আমরা জানি না? কালবৈশাখীর ঝড়ে, সাইক্লোনের তোড়ে কত বাড়ি ঘর চালা উড়ে যায়, গাছপালা মুখ থুবড়ে পড়ে, সমুদ্রতীরে দেখা দেয় উঁচু ঢেউ—মহূর্তে মাইলের পর মাইল ভাসিয়ে দেয়।

বাতাসের গতিবেগ মাপার চেষ্টা অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। ১৮০৫ সালে অ্যাডমিরাল স্যার ফ্রান্সিস বেফোর্ট বাতাসের গতিবেগ মাপের স্কেল প্রবর্তন করেন। প্রথম প্রথম নাবিকদের সুবিধার কথা ভেবে এই স্কেল চালু হল, পরে আবহাওয়াবিদরা ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার শুরু করেন। নাবিকেরা বাতাসের গতিবেগকে 'নট' এককে প্রকাশ করেন। 'এক নট' বলতে 'ঘণ্টায় এক নটিকাল মাইল' গতিবেগ বোঝায়। এক নটিকাল মাইল দৈর্ঘ্যে ৬০৮০ ফুটের সমান, কিন্তু এক মাইল দৈর্ঘ্য বলতে আমরা ৫২৮০ ফুট বুঝি।

বাতাসের গতি মাপার জন্য কাপ অ্যানিমোমিটার বলে এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। চারটি অর্ধগোলক চারটি লোহার কাঠির উপর বসানো থাকে এবং সবটা বাতাসের ধাক্কায় ঘুরতে পারে। প্রবাহিত বাতাস অর্ধ-গোলকের উত্তল দিকের থেকে অবতল দিকে জোরে আঘাত করে। এর ফলে অর্ধগোলক বা কাপগুলি জোরে ঘোরে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে যত বেশি কাপ ঘুরবে তত জোরে হাওয়া বইছে বলে মনে করা হবে। স্বয়ংক্রিয়

মাইল প্রতি ঘন্টা	<1	1-3	4-7	8-12	13-18	19-24	25-31	32-38	39-46	47-54	55-63	64-75	>75
বল	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
বর্ণনা	শান্ত	মৃদু বাতাস	লঘু বাতাস	হালকা বাতাস	মাঝারি বাতাস	মুক্ত বাতাস	ঝোড়ো বাতাস	মাঝারি ঝড়	ঝড়	জোরালো ঝড়	বিধ্বংসী ঝড়	–	–
প্রতিক্রিয়া													
প্রতীক													

ঝড়ের সংকেত

ব্যবস্থায় কত তাড়াতাড়ি কাপ ঘুরছে তা মাপা হয় এবং হিসাব কষে বলে দেওয়া যায়, কত জোরে বাতাস বইছে।
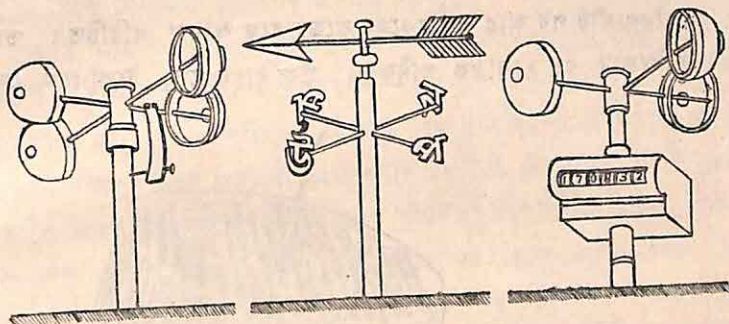
অ্যানিমোমিটার

জোরে হাওয়া বলতে আমরা সাধারণত ঝড় বুঝি। গ্রীষ্মের বিকালে বাংলাদেশে হামেশাই কালবৈশাখীর ঝড় দেখা যায়। দুপুর শেষে ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়, দিনের উষ্ণতা কমে আসে, প্রথমে শুধু হাওয়া, বাড়তে বাড়তে ঝড়, তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে শিল পড়াও খুব স্বাভাবিক ঘটনা।

উত্তর ভারত বা দিল্লীর দিকে এরকমই একটা ঝড় দেখা যায়। ঝড়ের নাম 'আঁধি'। আঁধিতে শুধু ধুলোই ওড়ে, বৃষ্টি বড় একটা হয় না। উত্তর ভারতে গ্রীষ্মের দুপুরে গরম হাওয়া, ধুলোর অভিযান মানুষের জীবন দুঃসহ করে দেয়—এর চলতি নাম 'লু'। এখন কথা হল, বাংলা দেশের এই কালবৈশাখীর (Nor'westers) কারণ কি ? এক কথায়, বাংলার পশ্চিমদিকে ছোটনাগপুরের মালভূমি এবং বাংলার সংলগ্ন সমুদ্র—দুইই এর কারণ। গরমের সারাদিন ছোটনাগপুরের মালভূমি, বাংলার রাঢ় অঞ্চল উত্তপ্ত হয়, স্বাভাবিকভাবেই এ সব জায়গা থেকে গরম বাতাস উপরে উঠে গিয়ে একটি নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি করে। এই নিম্নচাপকে ভরাট করতে বঙ্গোপসাগর থেকে ভেসে আসে জোলো বাতাস। দুই বাতাসের সংঘর্ষে কালবৈশাখীর ঝড় দেখা দেয় এবং জোলো বাতাসই বৃষ্টির কারণ হয়। একটা জিনিস দেখা গেছে, যে যে বছরে বঙ্গোপসাগর থেকে জোলো বাতাস গাঙ্গেয় বঙ্গভূমিতে কম আসে সে সে বছর কালবৈশাখীর ঘনঘটাও কম হয়।

ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য নানান রকমের স্থানীয় বাতাস দেখা যায়। কানাডার ভ্যাঙ্কুবারে 'উত্তুরে হাওয়া', ঘানায় 'হারমাট্টান বাতাস'—এমন কতো স্থানীয় বাতাস আছে।

কালবৈশাখীর পর আর এক রকমের ঝড়ের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তা হল সাইক্লোন বা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। উর্ধ্ববায়ুমণ্ডলে, ট্রপোপজে যে
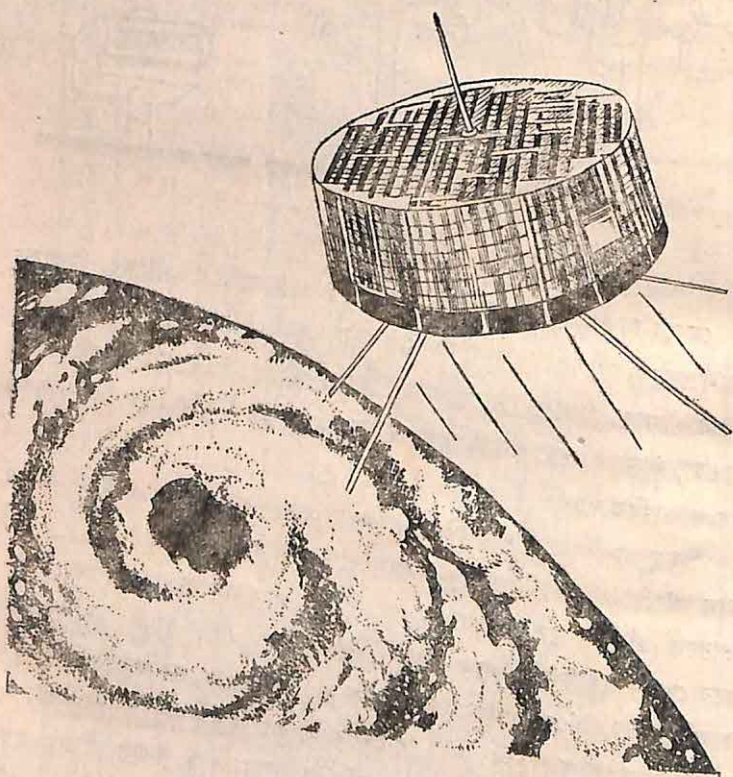
উপগ্রহ ও সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়

বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়, তার প্রভাবে নিম্নচাপের উৎপত্তি হয়। এই বায়ুস্রোত একশ' থেকে দেড়শ' নট গতিতে ছোটে। দুই গোলার্ধেই এই বায়ু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (Temperate Latitude) পশ্চিম থেকে পূবে প্রবাহিত হয়। উর্ধ্ববায়ুমণ্ডলের বায়ুস্রোত বঙ্কিম ভঙ্গীতে অগ্রসর হয়। বঙ্কিম ভঙ্গীর জন্য এই বাতাস কয়েক হাজার ফুট ওঠা-নামা করে। ওঠা-

নামা করার সময় এই বাতাস নিম্ন বায়ুমণ্ডলে পর্যায়ক্রমে চাপ দেয় ও চাপ তুলে নেয়। যেখানে চাপ পড়ছে সেখানে উচ্চ চাপ এবং যেখানে চাপ তুলে নিচ্ছে সেখানে নিম্নচাপের উৎপত্তি হয়।

প্রায় চারশ' মাইলের ব্যাসযুক্ত ঝোড়ো হাওয়ার দল নিয়ে ঘূর্ণিঝড় গঠিত। বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ মেঘ—জোলো বাতাসের এক তীব্র ঘূর্ণি-স্রোতের জন্ম দেয়। ঘূর্ণিস্রোতের কেন্দ্র বিন্দুকে সাইক্লোনের 'চোখ' বলে। কোরিওলিসের নিয়ম অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের ঝড় উত্তর-পূর্ব দিকে ধেয়ে আসে এবং বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গের তীরবর্তী জেলাগুলি, উড়িষ্যা, অন্ধ্র উপকূলে আঘাত করে। প্রতি বছরই আমাদের দেশে ছোটো বড়ো বেশ কয়েকটা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় দেখা যায়। এই ঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে দেশের মধ্যভাগে এসে দুর্বল হয়ে পড়ে, দুর্বল হতে হতে তিন চার দিন সময় চলে যায়।

নিম্নচাপ পাঁচশ মাইল দূরে অবস্থিত, ক্রমশ অগ্রসরমান—এই অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবর্তনগুলি ধাপে ধাপে লক্ষ্য করা সম্ভব। ঝড় যখন পাঁচশ মাইল দূরে তখন মাটি থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উপরে শ্বেতশুভ্র কেশ মেঘ (Cirrus cloud) ভাসতে দেখা যাবে। এর পর যত ঝড় এগিয়ে আসবে তত মেঘে পরিবর্তন হবে এবং বায়ুচাপ ক্রমশ হ্রাস পাবে। প্রথমে কেশ মেঘ পরিবর্তিত হবে কেশ-স্তর মেঘে (Cirro stratus), তারপর মধ্য স্তর মেঘে (Alto stratus), তারপর জলভরা স্তর মেঘে (Nimbo stratus)। দেখতে দেখতে বৃষ্টি শুরু হবে, ক্রমশ বৃষ্টি বাড়বে, হাওয়ার গতিবেগ বাড়বে। তাপর এক সময় হাওয়া, বৃষ্টি কমে আসবে, আকাশ অবশ্য মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। ঐ সময় ঝড়ের 'চোখ' দর্শকের অঞ্চলের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। 'চোখ' চলে গেলে আবার ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে, সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি। তবে এবারের বায়ুপ্রবাহের দিক ভিন্নমুখী, 'চোখ' আসার আগেকার হাওয়ার গতিমুখের বিপরীত দিকে। তারপর দ্রুত আবহাওয়ার উন্নতি হবে, বৃষ্টি ধরে আসবে, বায়ুচাপ বাড়বে। মেঘ আবার জলভরা স্তূপ মেঘের (Cumulonimbus) আকার থেকে ক্রমান্বয়ে মধ্য-স্তর মেঘ, কেশ-স্তর মেঘ ও কেশ মেঘে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ঘটনাটির সমাপ্তি হতে চার পাঁচ দিন সময় লাগবে।

শুধু বঙ্গোপসাগর কেন, পৃথিবীর অন্যত্রও সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় দেখি।

বঙ্গোপসাগরে যার নাম 'সাইক্লোন', দক্ষিণ চীন সাগরে তার নাম 'টাইফুন', ফ্লোরিডার উপকূলে 'হারিকেন', উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় 'উইলি উইলিস'—সর্বত্রই এক তাণ্ডবলীলা। খবরের কাগজে আমরা এদের বিধ্বংসী কাণ্ড-কারখানার খবর পাই। সমুদ্রের উপর ঘূর্ণিঝড় জলস্তম্ভের (water sprout) জন্ম দেয়। কয়েকশ' ফুট উঁচু সেই জলস্তম্ভ ভীম বেগে জলের উপর দিয়ে ধাবমান হয়ে এক সময় সশব্দে ফেটে পড়ে। কোন জাহাজ তার সামনে পড়লে আর রক্ষা নেই।

টরনেডো ও জলস্তম্ভ

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তাহলে আমাদের একটা ধারণা হল। কিন্তু সব ঘূর্ণিঝড় এক নয়। ঘূর্ণিঝড় বা টরনেডো ও সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সম্পূর্ণ আলাদা। টরনেডো খুবই সীমিত স্থানকে বিপন্ন করে, টরনেডো সম্পূর্ণ ধ্বংসের প্রতীক। এই ঝড় যাকে স্পর্শ করে তাকেই নিঃশেষিত করে দেয়।
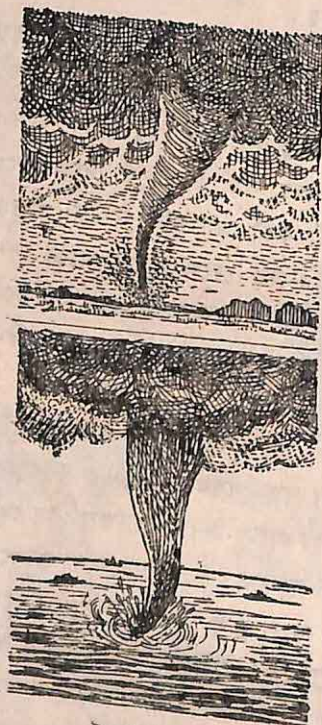
বজ্রবিদ্যুৎভরা মেঘ, সঙ্গে ঝড়—টরনেডোর মূল আকর। কিন্তু সব বজ্র-বিদ্যুৎভরা মেঘ টরনেডো সৃষ্টি করে না। আবহাওয়ার কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এর জন্য প্রথম ও প্রধান আবশ্যকতা একটি 'মাথাভারি' আবহমণ্ডল। সাধারণভাবে, এমন অবস্থার সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন আবহমণ্ডলের নিচের স্তরের গরম ও প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস উপরের স্তরের হিমেল হাওয়ার তলায় বন্দী হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সৃষ্ট বজ্রবিদ্যুৎভরা মেঘের কোল থেকে নিচের দিকে আসা ফানেলের আকারে দ্রুত ঘূর্ণ্যমান বাতাসই ঘূর্ণিঝড়ের বা টরনেডোর প্রধান লক্ষণ। এই দোলায়মান ও ঘূর্ণ্যমান ফানেল যখন মাটির কাছে আসে তখনই প্রলয়ংকারী অবস্থার সৃষ্টি হয়। যা কিছু এর পথে পড়ে তাই নিশ্চিহ্ন করে চলে যায়।

১৯৮৩ সালে চব্বিশ পরগনার গাইঘাটায় এমনই এক টরনেডোর ধাক্কায় বহু লোকের মৃত্যু হয়, ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়। অবশ্য আমাদের দেশে খুব একটা টরনেডো দেখা যায় না। সাধারণত আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম প্রান্ত ও বিশাল দক্ষিণ নিম্নভূমিতে টরনেডো বেশি দেখা যায়।

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের ধ্বংস করার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে টরনেডোর থেকে কম। প্রায় তিনশ' থেকে চারশ' মাইল ব্যাস নিয়ে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ঘণ্টায় দু'শ মাইল গতিবেগে ছুটে আসে, বাতাসের ধাক্কায় সমুদ্রের জল ঠেলে ফেঁপে তীরভূমির বহুদূর পর্যন্ত প্লাবিত করে। এর নাম 'টাইডাল ওয়েভ' বা সামুদ্রিক জলোচ্ছাস। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে এরকম একটি সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়। কয়েক বছর আগে অন্ধ্র-প্রদেশের উপকূলে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়।

ফ্লোরিডার উপকূলে প্রতিবছর হারিকেন হানা দেয়—সঙ্গে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস। স্থানীয় লোকেরা এদের নামকরণও করেছে। বছরের প্রথম ঝড়ের নাম অ্যামি (Amy), দ্বিতীয় ঝড়ের নাম বারবারা (Barbara) ইত্যাদি।

বাতাসের শক্তি যে শুধু ধ্বংস তাণ্ডবলীলা ডেকে আনে তা নয়, মানুষের
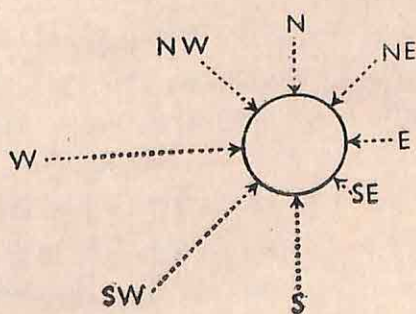
বায়ু-গোলাপ

কল্যাণ কাজে বাতাসের ভূমিকা আছে। প্রথম নাম করতে হয় উইণ্ড-মিলের। ইউরোপ, বিশেষত উত্তর ইউরোপের দেশগুলিতে বহুদিন

আগে থেকে উইণ্ডমিল ব্যবহার করে নানান প্রয়োজনীয় কাজ করা হয়। আজকাল শক্তিসমস্যার সমাধানে বায়ুশক্তি কিভাবে কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের দেশে, বিশেষত সমুদ্র উপকূলে হাওয়ার দাপট খুব বেশি, এখন দরকার এই হাওয়াকে কাজে লাগানো।

প্রবাহিত বাতাস পৃথিবীর রূপ পরিবর্তন করে, তবে ধীরে ধীরে। গাছ-পালার বীজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে নিয়ে যায় হাওয়া। সমুদ্রতীরে, মরুভূমিতে বালিয়াড়ি গড়ে তোলে এই বাতাস। বাতাস আনে মুক্তি, আনে চিত্তের আনন্দ।

মেঘের পরে মেঘ জমেছে

আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে অলস সময় কাটাতে বেশ লাগে। কেমন সাদা সাদা ফুলো ফুলো তুলোর মতো মেঘ আকাশের এক দিক থেকে অন্য দিকে চলেছে। কখনো তার চেহারা সিংহের মতো, কখনো ঐরাবতের মতো। কল্পনার থেই হারিয়ে যায়।

আবার কালবৈশাখীর কালো দুরন্ত মোষের চেহারার মতো মেঘ মনে ত্রাস আনে—ও কি ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসছে? সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের আকাশে লাল লাল মেঘ বা সন্ধ্যার সিঁদুরে মেঘ মন আকুল করে তোলে। কখনো আকাশে পেঁজা তুলোর স্তূপ, কখনো কোদালে চষা ক্ষেত, কখনো বা ঘন নীলের বুকে এক টুকরো ছোট্ট মেঘ একা দোল খাচ্ছে।

সূর্যের তাপে সাগর নদী বিল থেকে জল বাষ্প হয়। জলীয় বাষ্প বাতাসের থেকে হালকা। তাই বাষ্প ভাসতে ভাসতে হাওয়া ঠেলে উপরে উঠে যায়, সেখানে গিয়ে মেঘের আকার নেয়। জলীয় বাষ্প যখন মেঘ হয় তখন ঠিক ঠিক জলীয় বাষ্প থাকে না। যত উপরে ওঠা যায় তত ঠাণ্ডা, তত লঘু বায়ুচাপ। হালকা চাপে বাষ্প প্রসারিত হয়, প্রসারণ হওয়ার দরুন বাষ্প আরো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এভাবে ঠাণ্ডা হতে হতে বাষ্প জমে গিয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণার রূপ নেয়। জলকণাগুলি এত ছোট যে তারা সহজেই উঁচু বাতাসে ভাসতে পারে। জলকণাগুলি কখনো অতিরিক্ত শীতলতায়, যেমন −২০° বা −৩৫° সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। বাতাসে সব সময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধুলোর কণা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাছাড়া সমুদ্র থেকে জল বাষ্প হয়ে উঠে আসার সময় মিহি নুনের গুঁড়ো তুলে নিয়ে আসে। এ সবকে আশ্রয় করে জলীয় বাষ্প জমে জলকণা, পরে বরফ কণার চেহারা নেয়। সাদা সাদা রাশি রাশি বরফের কুচি, শীতল জলকণা—এসব মিলেই উঁচু আকাশে মেঘের দল বেড়ে ওঠে। জলীয় বাষ্পই যে মেঘ তার প্রমাণ দিয়েছিলেন উইলসন সাহেব, তাঁর 'মেঘের ঘর' (Cloud Chamber) তৈরি করে।

অনেকদিন ধরে মানুষ মেঘেদের চালচলন লক্ষ্য করে আসছে। কোন

মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন্ মেঘে হয় না, কোন্ মেঘ বৃষ্টির পূর্বাভাস, কোন্ মেঘ ঝড়ের পূর্বাভাস-তা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। দেখে শুনে আবহাওয়াবিদরা
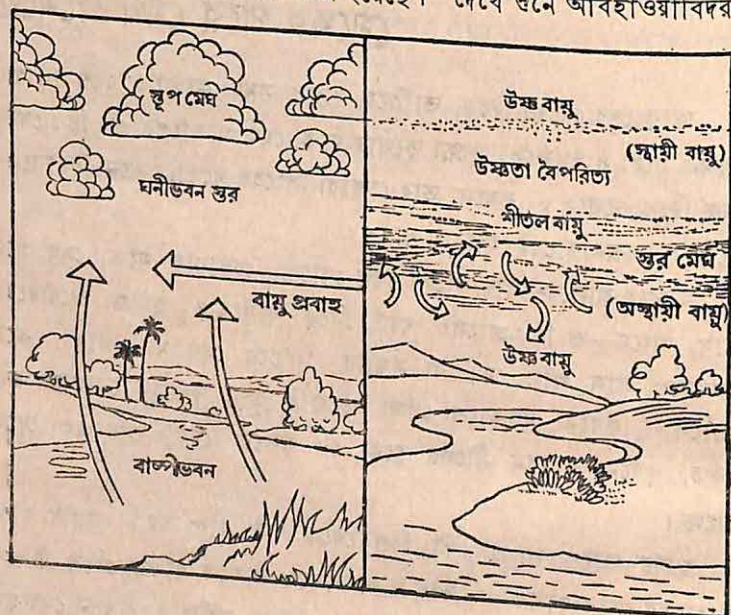
মেঘের জন্ম

আকাশে অন্তত বারো রকমের মেঘের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের সব গালভরা নাম দিয়েছেন, আর নামগুলি বড়সর বলে তাদেরকে চেনাবার জন্য প্রত্যেককে এক একটা চিহ্ন দিয়ে পরিচয় করিয়েছেন। আজ থেকে মাত্র একশ পঞ্চাশ বছর আগে লণ্ডনের এক ওষুধের কারবারী লিউক হাওয়ার্ড মেঘেদের নাম দিয়েছিলেন। আমরা এদের নাম-ধাম পরিচয় সম্পর্কে এবার কিছু বলবো।

মেঘের রঙবাহার

বেশির ভাগ মেঘ বায়ুমণ্ডলের নিচে অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়ারে বন্দী থাকে। মাঝে মাঝে দৈবাৎ ঊর্ধ্বাকাশে অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ারে দু'এক রকমের মেঘের সাক্ষাৎ মেলে। সূর্যাস্তের কিছু পরে কচিৎ নরওয়ের আকাশে প্রায় বিশ মাইল উঁচুতে 'মাদার অব পার্ল' এবং মাইল পঞ্চাশ উঁচুতে 'নকটিলুসেন্ট' মেঘের দেখা পাওয়া যায়।

সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের আকাশের মেঘ রক্তিম আভায় আলোকিত হয়। কোথা থেকে আসে লাল রঙ? দিগন্তরেখায় যখন সূর্য অবস্থান করে তখন সূর্যরশ্মিকে দীর্ঘ বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে আসতে হয়। লম্বা পাড়িতে আলোর সঙ্গে অজস্র জলকণা আর ধূলিকণার দেখা হয়। বিন্দু বিন্দু এই জলকণা ও ধূলিকণা সূর্যের সাদা আলোকে বিচ্ছুরিত করে নীল, বেগুনী রঙের অংশ আকাশের পথে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়, আর লাল কমলা অংশকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসতে দেয়। তাই সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের আকাশ বা মেঘকে লাল দেখি। বায়ুমণ্ডল না থাকলে রঙিন আকাশ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হত না। চাঁদ থেকে এজন্য তার আকাশকে নীল, লাল, কমলা দেখায় না, নিকষ কালো বলে মনে হয়। কোন কারণে বাতাসে যদি ধূলিকণা বেড়ে যায় তাহলে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের আকাশ আরো বেশি রক্তিম দেখাবে। যেমন, কিছুদিন আগে মেক্সিকোর আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তায় বাতাসে ধুলো-গ্যাস বেড়ে গেল, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি আরো রঙিন, আরো বর্ণাঢ্য সূর্যাস্ত সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য লাভ করলো। গত শতাব্দীতে জাভা দ্বীপের কাছে ক্রাকোতোয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের অনেক দিন পরেও পৃথিবীতে মাত্রাতিরিক্ত রক্তাভ সূর্যাস্ত দেখা যেত। আকাশময় সে ধূলিকণা পৃথিবীর মাটিতে ঝড়ে পড়তে বেশ কয়েক বছর সময় নিয়েছিল।

উচ্চতা হিসাবে মেঘেরা তিন ভাগের—উচ্চ, মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর মেঘ। বিভিন্ন ধরনের মেঘের প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। যেমন Stratus বা স্তর মেঘ মাটির উপরে প্রায় দুই থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বিছিয়ে থাকে। এ মেঘের বৃষ্টি দেবার ক্ষমতা নেই। Nimbostratus বা জলভরা স্তর মেঘ মাটি থেকে খুব উঁচুতে ভাসে না, বর্ষাকালে বিশেষ করে এই মেঘ বেশ নিচে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ে। এগুলোর ঘন কালো আকার, একটা বিশালাকায় জলাধার বলা যায়। এরকম একটা ঝোড়ো কালো মেঘে কয়েক লক্ষ টন জল ধরতে পারে। এতটা জল ঠাসাঠাসি করে আছে বলে জলভরা মেঘ মোষের মতো কালো দেখায়।

Stratocumulus বা স্তরস্তূপ মেঘ মাটি থেকে বেশ উঁচুতে ভাসে। এই মেঘ ফুলো ফুলো তুলোর স্তূপের মতো দেখতে, মেঘের নিচটা স্তর মেঘের মতো প্রসারিত হয়ে পড়ে। Fair weather cumulus, পরিষ্কার দিনের

স্তর মেঘ
জলভরা স্তূপ মেঘ
জলভরা স্তর মেঘ
মধ্য স্তর মেঘ
স্তর-স্তূপ মেঘ
মধ্য-স্তূপ মেঘ
স্তূপ মেঘ
কেশ মেঘ
বৃহৎ স্তূপ মেঘ
কেশ-স্তূপ মেঘ

বিভিন্ন শ্রেণীর মেঘ
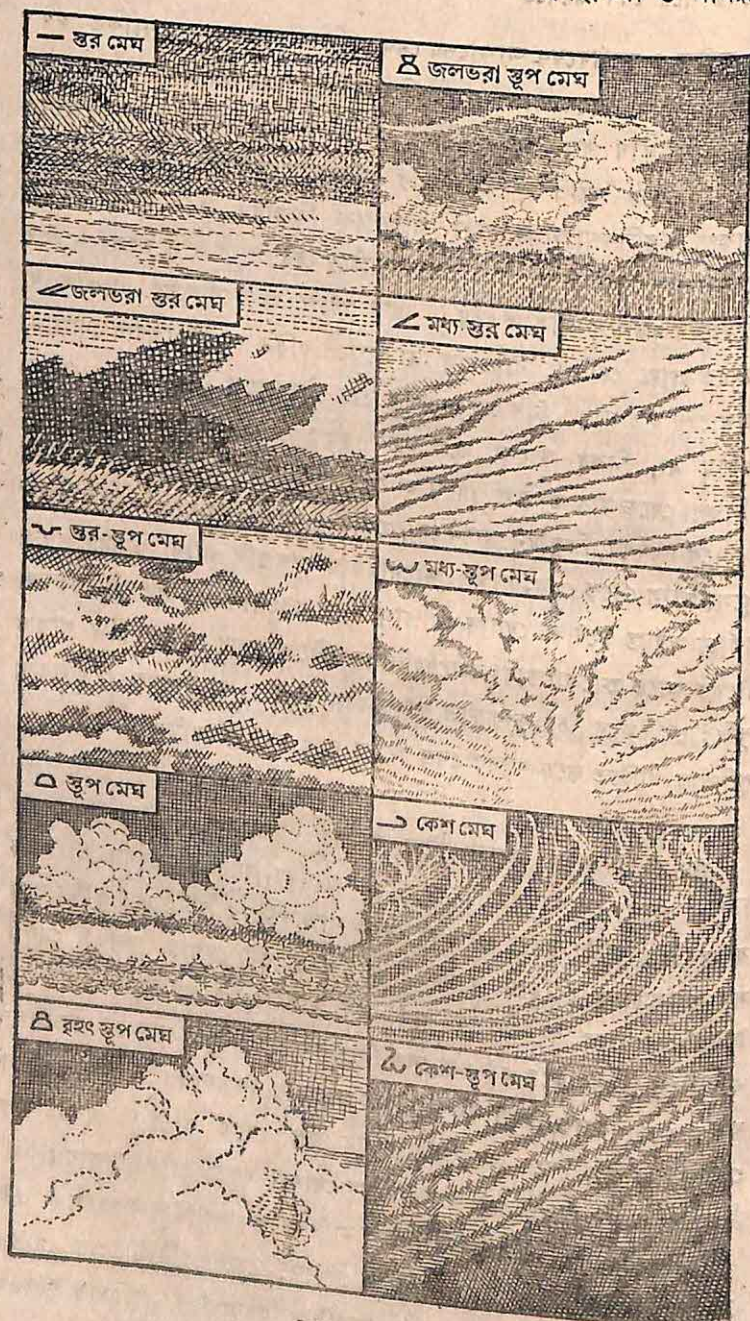
স্তূপ মেঘ ছোট ছোট মেঘের স্তূপ বানিয়ে উর্ধাকাশে ঘুরে বেড়ায়। ঘন নীল আকাশে এই সব সাদা মেঘ দেখতে চমৎকার। Large Cumulus বা বৃহৎ
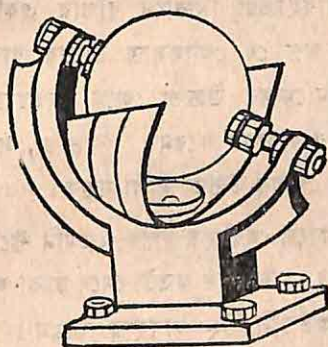
সূর্যালোক পরিমাপ যন্ত্র

স্তূপ মেঘ শরৎকালের আকাশে দেখা যায়। এরকম মেঘে বরফের অসংখ্য কুচি ও অতি শীতল জলকণা থাকে। এ মেঘে আদৌ বৃষ্টি হয় না।

Cirrus বা কেশ মেঘ মাটির উপরে বিশ থেকে চল্লিশ হাজার ফুট উঠে

মেঘমুক্ত আকাশ

আকাশের এক অষ্টমাংশ মেঘাচ্ছন্ন

" এক চতুর্থাংশ "

" তিন অষ্টমাংশ "

" অর্ধেক "

" পাঁচ অষ্টমাংশ "

" ছয় অষ্টমাংশ "

" সাত অষ্টমাংশ "

পুরোপুরি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ "

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের প্রতীক

ছড়ানো চুলের মতো ভাসে। Cirrocumulus বা কেশস্তূপ মেঘ উর্ধ্বাকাশে

থোকা থোকা দলা দলা কেশের মতো ভাসে। Altocumulus বা কোদালে মেঘ আকাশকে চষা ক্ষেতের চেহারা দেয়।

আধুনিক যুগে আবহাওয়া বিজ্ঞানে রাডার একটি শক্তিশালী যন্ত্র। দূরাগত ঝড়ের সন্ধানের জন্য যে কেবলমাত্র রাডার ব্যবহার হয় তা নয়, আকাশের বুকে ভাসমান মেঘের উচ্চতা জেনে নেওয়ার কাজে আজকাল আবহাওয়াবিদরা রাডার ব্যবহার করেন। তাছাড়া, সার্চলাইটের আলো ফেলে বা বেলুন পাঠিয়ে মেঘের উচ্চতা মাপা সম্ভব।

আকাশ যেমন বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তেমনি শীতের দিনে পরিষ্কার ঝকঝকে দিনও দেখা যায়। আকাশ কতটা মেঘে ঢাকা আছে তা বোঝাবার জন্য আবহাওয়াবিদরা কতগুলি চিহ্ন ব্যবহার করেন। পুরো আকাশটার আট ভাগ কল্পনা করে, তার কত অংশ মেঘে ঢাকা তা প্রতীক চিহ্নে বোঝানো হয়। আবহাওয়াবিদদের আন্তর্জাতিক কোডগুলির মধ্যে এ চিহ্ন একটি প্রধান চিহ্ন।

বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়

মেঘের কথা বললে বজ্রপাতের প্রসঙ্গ না এনে পারা যায় না। মেঘ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত খুব সাধারণ ঘটনা। পৃথিবীতে বছরে প্রায় ষাট লক্ষ বাজ পড়ে, দিনে গড়ে আশি জনের মতো মানুষ বজ্রাঘাতে আহত হয়, বিশ জনের মতো মারা যায়।

মজার কথা, পৃথিবীর সব জায়গায় সমান তালে বাজ পড়ে না। মেরুর দেশে, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রীণল্যাণ্ডে দশ বছরে একবার বাজ পড়ে কিনা সন্দেহ। মাঝ দরিয়ায় জাহাজের উপর কচিৎ বাজ পড়তে দেখা গেছে। সব থেকে বেশি বজ্রপাত হয় বিষুবরেখার কাছাকাছি দেশে—জাভা, মেক্সিকো, ব্রাজিলে। জাভাতে বছরের প্রায় দু'শ তেইশ দিনই বাজ পড়ে। আমাদের দেশেও ভালোরকম বজ্রপাত হয়। বর্ষার শুরুতে বা শেষ হবার সময় এদের ঘনঘটা বেশি। মাঝ বর্ষায় তেমন বাজের কান ফাটানো আওয়াজ পাওয়া যায় না।

শরতের আকাশে যে সাদা তুলোর মতো মেঘ ভাসে তা থেকে বাজ-পড়ার ভয় নেই। কারণ ওতে যথেষ্ট জলকণা নেই। বিদ্যুৎ জন্মায় কালো

মেঘে। কালবৈশাখীর কালো মেঘে টন টন ওজনের জল বোঝাই থাকে। এসব মেঘে বাতাস ঢুকে জোরসে নাড়া দেয়, মেঘের মধ্যে ছোট ছোট

বজ্রপাত

হাওয়ার ঘূর্ণি ঘুরতে থাকে। মেঘ ও হাওয়ার ঘষাঘষিতে বিদ্যুৎ ঝিলিক দেয়। কাচকে ফ্ল্যানেল দিয়ে ঘষলে যেমন স্থিরতড়িৎ জন্মায়, ঠিক তেমনভাবে মেঘে জন্ম নেয় তড়িৎ। মেঘের মধ্যে যে তড়িৎ জন্ম নেবে, সে তার বিপরীত ধরনের তড়িৎ উঁচু গাছে, উঁচু বাড়িতে আবিষ্ট করবে। এই দুই তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করবে, টানাটানির দরুন মেঘ থেকে বিদ্যুৎ গাছে বাড়িতে চোখের পলকে আছড়ে পড়বে—এরই নাম 'বাজ পড়া'।

বাজ আটকানোর কি কোন উপায় আছে? বড় বড় বাড়ির ছাদে একটা খাড়া ধাতুর শলাকা বসিয়ে তার গা থেকে একটা তামার তার মাটি

পর্যন্ত টেনে নিয়ে মাটিতে গাঁথতে হবে। ধাতুর তৈরি তারে বিদ্যুৎ ভালো করে ছুটতে পারে বলে আকাশের তড়িৎকে দেখতে না দেখতে মাটি টেনে নেবে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পরামর্শে এ সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজকাল অন্যভাবেও বজ্রপাত প্রতিরোধের ব্যবস্থা হচ্ছে। যেমন, আমেরিকান সাহেবেরা মেঘের মধ্যে ধাতু দিয়ে বানানো ছুঁচ ছুঁড়ে বা সিলভার আয়োডাইড ছড়িয়ে বজ্রপাত নিবারণের চেষ্টা করছেন।

মেঘের শ্রেণীবিভাগ

নাম	বৈশিষ্ট্য
(ক) নিম্ন আকাশের মেঘ (৭০০০ ফুটের মধ্যে)	
(১) স্তর মেঘ (Stratus—St)	মাটি থেকে দু'এক হাজার ফুটের মধ্যে স্তর মেঘ বিছানো থাকে। হালকা ছাই রঙ। এই মেঘ নিচে নামলে কুয়াশার রূপ নেয়। সকালের কুয়াশা মিলিয়ে গিয়ে স্তর মেঘ হতে পারে। পাহাড়ের গায়ে এই মেঘ লেগে থাকে। পাহাড়ের ঢালু পথে স্তর মেঘ ওঠানামা করে। স্তর মেঘের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই।
(২) জলভরা স্তর মেঘ (Nimbo stratus—NbSt)	ঘন কালো রঙের ছড়ানো মেঘ, এই মেঘে বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণভাবে স্তর মেঘে বৃষ্টির কারণ ঘটলে জলভরা স্তর মেঘ দেখা যায়।
(৩) স্তূপ মেঘ (Cumulus—Cu)	সাদা ফুলো ফুলো তুলোর মতো মেঘ। শরৎকালে এই মেঘ দেখা যায়। এই মেঘের উপরের অংশ ঢেউ খেলানো, কিন্তু নিচের অংশ ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল। স্তূপ মেঘ বিচ্ছিন্নভাবে আকাশে ঘুরে বেড়ায়। এই মেঘের উপরের অংশ সূর্যের আলোয় চকচক

করে। ক্বচিৎ এই মেঘে বৃষ্টিপাত বা বজ্রপাত হয়।

(৪) স্তূপ জলভরা মেঘ (Cumulo nimbus—CuNb) স্তূপ মেঘের সঙ্গে জলভরা মেঘের মিশ্রণে স্তূপ জলভরা মেঘ জন্ম নেয়। এই মেঘ নিম্ন আকাশ ছাড়িয়ে উচ্চ আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই মেঘের বৃষ্টি, ঝড়, বজ্রপাতের ক্ষমতা আছে। স্তূপ জলভরা মেঘ থেকে সময় বিশেষে টর্নেডোর উৎপত্তি হতে পারে।

(৫) স্তর-স্তূপ মেঘ (Strato cumulus—StCu) ছেঁড়া ছেঁড়া স্তূপ মেঘ—ছাই ছাই রঙ, হালকাভাবে বাতাসে ভেসে থাকে। ছড়ানো থাকার দরুন স্তূপ মেঘের আকার থাকে না, বরং স্তর মেঘের মতো দেখায়।

(খ) মধ্য আকাশের মেঘ (৭০০০-২০,০০০ ফুটের মধ্যে)

(১) মধ্য-স্তর মেঘ (Alto stratus-Ast) হালকা ছাই রঙের ছড়ানো মেঘ। এই মেঘের মধ্যে ধোঁয়াটে সূর্য বা চাঁদ দেখা যাবে। এই মেঘ জলভরা স্তর মেঘে রূপান্তরিত হয়। মধ্য-স্তর মেঘ থেকে কখনো কখনো বৃষ্টিপাত হয়।

(২) মধ্য-স্তূপ মেঘ (Alto Cumulus—Acu) কোদালে সাদা মেঘ। চষা ক্ষেতের মতো দেখতে। ঝড়ো আবহাওয়ার পূর্বে এই মেঘ দেখা যেতে পারে। মাঝে মাঝে এই মেঘ ছোট ছোট চূড়া নিয়ে আকাশে ভেসে বেড়ায়।

(গ) উচ্চ আকাশের মেঘ (২০,০০০ ফুটের উপরে)

(১) কেশ মেঘ (Cirrus—Ci) হালকা পালকের মতো এই মেঘ উচ্চাকাশে ঘুরে বেড়ায়। এই মেঘ প্রধানত বরফ কণা দিয়ে তৈরি। ইউরোপে লোকগাথায় একে 'ঘোটক পুচ্ছ' বলে।

সাধারণভাবে কেশ মেঘ আকাশের অনেকখানি দখল করে রাখে। গড়পড়তা কেশ মেঘ ৫০,০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থান করে। এই মেঘে কোন বৃষ্টি হয় না। 'পুচ্ছ' নিম্নমুখী হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না, আর উর্ধ্বমুখী হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

(২) কেশ-স্তর মেঘ
(Cirro stratus—CiSt)

সাদাটে ঘোলা ঘোলা মেঘ সমস্ত আকাশময় ছড়ানো থাকে। কেশ স্তর মেঘ সূর্য বা চাঁদকে আড়াল করতে পারে না। সূর্য ও চন্দ্রের শোভার পিছনে কেশ-স্তর মেঘের হাত আছে। এই মেঘ থেকে মধ্য স্তর মেঘ ও পরে জলভরা স্তর মেঘ জন্ম নেয়—তাই এই মেঘকে বৃষ্টির পূর্বাভাস বলা যায়।

(৩) কেশ-স্তূপ মেঘ
(Cirro cumulus—CiCu)

এই মেঘ সর্বাপেক্ষা সুন্দর। কেশ স্তূপ মেঘের সৌন্দর্য অসীম। অতি উচ্চ আকাশে হালকা সাদা সাদা দলা দলা এই মেঘ ঘুরে বেড়ায়। রেখা বরাবর ঢেউ-এর মতো কেশ-স্তূপ মেঘ সাজানো থাকে।

বিজ্ঞানীরা একটা ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। মানুষের দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলতে পারে। তাই আর কিছু না পেলে আকাশের তড়িৎ মানুষের শরীর ধরে মাটিতে পৌছাবে। এ হলে মৃত্যু নিশ্চিত। এক মেঘ স্তূপ থেকে লাফিয়ে বিদ্যুৎ অন্য মেঘে চলে যায়। কি সুন্দর আঁকা-বাঁকা রেখা, চোখ ধাঁধানো আলো। মেঘের মধ্যে এমনভাবে বিদ্যুৎ ছুটলে বাতাস ভীষণ, ভীষণ গরম হয়ে যায়, গরম বাতাস ফেঁপে ওঠে, তাতে শব্দ হয় জোরে—খুব জোরে। আমরা বলি—মেঘ ডাকছে।

বাজের চোখ ধাঁধানো আলো ও কানে তালা লাগানো শব্দ এক সঙ্গে পাওয়া যায় না। বিদ্যুতের আলো ও শব্দ একসঙ্গে জন্ম নিলেও আলো

শব্দের চেয়ে জোরে ছোটে বলে আমরা আলো সঙ্গে সঙ্গে দেখি, কিন্তু শব্দ শুনি কিছু পরে। এজন্য একটা কথা আছে—বাজের শব্দ যে শুনেছে সে তাতে আহত হয় না।

গুরুগম্ভীর মেঘ গর্জন ভেসে এলেও কখনো কখনো বিদ্যুতের রেখা চোখে পড়ে না। মেঘের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ সারার চেষ্টা করলেও সব কাজ গোপন থাকে না। মেঘের মধ্যে আলোর আভা চমকে চমকে ওঠে বা দিগন্ত রেখার ওপার থেকে বিদ্যুৎ জানান দেয়।

এই যে সবাই বলে—'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত', তা কি সম্ভব? হ্যা সম্ভব। কখনো কখনো মেঘের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে বহু দূর এগিয়ে যায়, তারপর এক সময় হঠাৎ মাটিতে লাফিয়ে নামে। এমন-ও হতে পারে, যেখানে লাফিয়ে নামলো সেখানকার আকাশ পরিষ্কার নীল।

বজ্রপাতের সময় এক রহস্যময় অগ্নি গোলকের (fire ball) কথা শোনা গেছে। কিছুদিন আগে গাইঘাটার টর্নেডো ঝড়ের মধ্যে গ্রামবাসীরা একটি অগ্নিগোলক দেখেছেন। অগ্নিগোলকের পিছনে ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে প্রায় ফুটবলের মতো দেখতে একটা আগুনের গোলা আকাশ থেকে নেমে আসে, মাটির কাছাকাছি কিছুক্ষণ লাফালাফি করে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। এর রঙ কখনো লাল, কখনো হলুদ, কখনো বা নীল-বেগুনী।

প্রতিবছরই বজ্রাঘাতে আমাদের দেশের মানুষ মারা যায়। কতগুলি সাবধানতা নিলে বিপদের সম্ভাবনা কমে। যেমন, খুব ঝড় বৃষ্টির সময় খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়, শুয়ে পড়াই ভালো। বড় গাছ, বাড়ি বা পিলারের নিচে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। আমাদের অনেকের নিশ্চয় মনে আছে কয়েক বছর আগে খেলার মাঠ ফিরতি কয়েকটি যুবক ময়দানের সৈনিক-স্মৃতি পিলারের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন—অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তাঁরা সবাই মারা যান। শুধু বাড়ি, পিলারের নিচে কেন, ঝড় বৃষ্টির সময় কাঁটাতারের বেড়ার ধারে দাঁড়ানো মোটেই নিরাপদ নয়। রেডিও, টি. ভি, টেলিফোন নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। নদী পুকুর বা সাগরে সাঁতার দেওয়া বিপজ্জনক। এমন কি ঘরের দেয়ালের পাশে না থেকে ঘরের মাঝে আশ্রয় নেওয়া ভালো।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

বৃষ্টি ! নিদারুণ খরদাহের পর বৃষ্টির আশীর্বাদে পরিতৃপ্ত প্রাণ, পরিতৃপ্ত জীবন। সূর্যের তাপে সাগর থেকে উঠে আসা জলীয় বাষ্প উর্ধ্বাকাশে গিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে, ফুলতে গিয়ে বাষ্প আরো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একে আমরা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'পরাবর্ত শীতলীভবন' (adiabatic cooling) বলি। এদিকে আবার বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে ঘনত্ব কম, বাতাস বেশ পাতলা ও শীতল। প্রতি এক হাজার ফুট উচ্চতায় প্রায় দুই ডিগ্রী উষ্ণতা কমে, এর নাম 'শুষ্ক পরাবর্ত অবনমন হার' (dry adiabatic lapse rate)। গরম বাতাসের উর্ধ্বমুখী গতিকে অবলম্বন করে গ্লাইডার ওড়ানো হয়। উঁচু আকাশে চিল যে ডানা ছড়িয়ে ভেসে থাকে তা-ও সম্ভব ঐ উর্ধ্বমুখী বাতাসের জন্য।

যতক্ষণ পরাবর্ত শীতলীভবনের জন্য উষ্ণতা কমে জলীয় বাষ্পের উষ্ণতা পারিপার্শ্বিক শীতল বায়ুর উষ্ণতার সমান না হবে, ততক্ষণ সেই বাষ্প উপরে উঠতেই থাকবে। এরকম মেঘ-বাতাসের অংশকে আমরা 'অস্থায়ী অবস্থা' বলি। এরপর এক সময় বাষ্পের উষ্ণতা চারপাশের উষ্ণতার সমান হয়ে যাবে বা বাষ্প, তার অপেক্ষা নিম্ন উষ্ণতার বায়ুমণ্ডলের নিচে এসে পৌঁছাবে। এই অবস্থানের নাম 'স্থায়ী অবস্থা'।

স্থায়ী অবস্থায় জলীয় বাষ্প শীতল হয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমে স্তূপ মেঘ, পরে জলভরা স্তূপ মেঘের রূপ নেয়। বিন্দু বিন্দু জলকণা এর পর মিলে মিশে গড়ে তোলে বড় বড় জলের ফোঁটা। বড় ফোঁটা পৃথিবীর টানে মাটিতে নামে, আসে বৃষ্টি। একটা জলের ফোঁটার ব্যাস আধ মিলিমিটার থেকে পাঁচ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

বাতাসের ধূলোকণাকে আশ্রয় করে যে জলবাষ্প জমে ওঠে তা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রমাণিত হয়েছে। আকাশের মেঘ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হলেই যে তা বৃষ্টি হয়ে ঝরবে, তা নয়; অনেক সময় অতি শীতল জলবাষ্প-মেঘ, ভাসমান বরফ কুচির সঙ্গে উর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে থাকে। বরফ দানার মাত্রা কিছুটা বাড়লে বৃষ্টির প্রবণতা যায় বেড়ে। আকাশে অতিশীতল জলকণা, এমনকি

–২০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা অর্জন করে। অতিশীতল জলকণার স্থায়িত্বের জন্য আকাশ জুড়ে তেমন বড় বরফ দানা জমতে পারে না।

অগ্রসরমান সীমানা

'স্থায়ী অবস্থায়' বাতাস যদি জলবাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে বাষ্প জমে গিয়ে ছোট ছোট জলকণার আকার নেয়। ভীষণভাবে ঠাণ্ডা জলকণা, বরফ কণা বাতাসে ভাসমান ধুলোকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে—এর নাম মেঘ। আকাশে মেঘ জমলেই বৃষ্টি হবে তার কোন মানে নেই। আসলে বৃষ্টি নামার পিছনে আরো কতগুলি কারণ কাজ করে।

বাতাসের উষ্ণতা ভেদে এক রাশ বাতাস অন্য বাতাস থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। উষ্ণ বাতাস এবং শীতল বাতাস পাশাপাশি থাকতে পারে। এমন-ও হয় যে উষ্ণ বাতাস ধীরে ধীরে শীতল বাতাসের

বায়ু সীমানা

দিকে এগোতে থাকে, শীতল বাতাস পিছু হঠে। দু'ধরনের বাতাসের সংযোগস্থলকে আমরা 'সীমানা' (front) বলি। উষ্ণ বাতাস যদি শীতল বাতাসের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে বলবো—অগ্রসরমান উষ্ণ সীমানা। বিপরীতে, শীতল বাতাস যদি উষ্ণ বাতাসের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে বলবো—অগ্রসরমান শীতল সীমানা। কখনো কখনো দুটি ভিন্ন উষ্ণতার

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে

বৃষ্টি! নিদারুণ খরদাহের পর বৃষ্টির আশীর্বাদে পরিতৃপ্ত প্রাণ, পরিতৃপ্ত জীবন। সূর্যের তাপে সাগর থেকে উঠে আসা জলীয় বাষ্প ঊর্ধ্বাকাশে গিয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে, ফুলতে গিয়ে বাষ্প আরো ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একে আমরা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'পরাবর্ত শীতলীভবন' (adiabatic cooling) বলি। এদিকে আবার বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে ঘনত্ব কম, বাতাস বেশ পাতলা ও শীতল। প্রতি এক হাজার ফুট উচ্চতায় প্রায় দুই ডিগ্রী উষ্ণতা কমে, এর নাম 'শুষ্ক পরাবর্ত অবনমন হার' (dry adiabatic lapse rate)। গরম বাতাসের ঊর্ধ্বমুখী গতিকে অবলম্বন করে গ্লাইডার ওড়ানো হয়। উঁচু আকাশে চিল যে ডানা ছড়িয়ে ভেসে থাকে তা-ও সম্ভব ঐ ঊর্ধ্বমুখী বাতাসের জন্য।

যতক্ষণ পরাবর্ত শীতলীভবনের জন্য উষ্ণতা কমে জলীয় বাষ্পের উষ্ণতা পারিপার্শ্বিক শীতল বায়ুর উষ্ণতার সমান না হবে, ততক্ষণ সেই বাষ্প উপরে উঠতেই থাকবে। এরকম মেঘ-বাতাসের অংশকে আমরা 'অস্থায়ী অবস্থা' বলি। এরপর এক সময় বাষ্পের উষ্ণতা চারপাশের উষ্ণতার সমান হয়ে যাবে বা বাষ্প, তার অপেক্ষা নিম্ন উষ্ণতার বায়ুমণ্ডলের নিচে এসে পৌঁছাবে। এই অবস্থানের নাম 'স্থায়ী অবস্থা'।

স্থায়ী অবস্থায় জলীয় বাষ্প শীতল হয়ে বিন্দু বিন্দু জলকণায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমে স্তূপ মেঘ, পরে জলভরা স্তূপ মেঘের রূপ নেয়। বিন্দু বিন্দু জলকণা এর পর মিলে মিশে গড়ে তোলে বড় বড় জলের ফোঁটা। বড় ফোঁটা পৃথিবীর টানে মাটিতে নামে, আসে বৃষ্টি। একটা জলের ফোঁটার ব্যাস আধ মিলিমিটার থেকে পাঁচ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

বাতাসের ধুলোকণাকে আশ্রয় করে যে জলবাষ্প জমে ওঠে তা বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে প্রমাণিত হয়েছে। আকাশের মেঘ যথেষ্ট ঠাণ্ডা হলেই যে তা বৃষ্টি হয়ে ঝরবে, তা নয়; অনেক সময় অতি শীতল জলবাষ্প-মেঘ, ভাসমান বরফ কুচির সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে থাকে। বরফ দানার মাত্রা কিছুটা বাড়লে বৃষ্টির প্রবণতা যায় বেড়ে। আকাশে অতিশীতল জলকণা, এমনকি

–২০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা অর্জন করে। অতিশীতল জলকণার স্থায়িত্বের জন্য আকাশ জুড়ে তেমন বড় বরফ দানা জমতে পারে না।

অগ্রসরমান সীমানা

'স্থায়ী অবস্থায়' বাতাস যদি জলবাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে বাষ্প জমে গিয়ে ছোট ছোট জলকণার আকার নেয়। ভীষণভাবে ঠাণ্ডা জলকণা, বরফ কণা বাতাসে ভাসমান ধুলোকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে—এর নাম মেঘ। আকাশে মেঘ জমলেই বৃষ্টি হবে তার কোন মানে নেই। আসলে বৃষ্টি নামার পিছনে আরো কতগুলি কারণ কাজ করে।

বাতাসের উষ্ণতা ভেদে এক রাশ বাতাস অন্য বাতাস থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। উষ্ণ বাতাস এবং শীতল বাতাস পাশাপাশি থাকতে পারে। এমন-ও হয় যে উষ্ণ বাতাস ধীরে ধীরে শীতল বাতাসের

বায়ু সীমানা

দিকে এগোতে থাকে, শীতল বাতাস পিছু হঠে। দু'ধরনের বাতাসের সংযোগস্থলকে আমরা 'সীমানা' (front) বলি। উষ্ণ বাতাস যদি শীতল বাতাসের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে বলবো—অগ্রসরমান উষ্ণ সীমানা। বিপরীতে, শীতল বাতাস যদি উষ্ণ বাতাসের দিকে এগিয়ে যায় তাহলে বলবো—অগ্রসরমান শীতল সীমানা। কখনো কখনো দুটি ভিন্ন উষ্ণতার

বাতাস মুখোমুখি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—এর নাম 'আধা স্থির সীমানা' (Quasi Stationary Front)। মাঝে মধ্যে বাতাসের শীতল সীমানা দৌড়ে এসে পিছন থেকে উষ্ণ সীমানাকে ধরে ফেলে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তার নাম 'অন্তর্ধৃতি সীমানা' (Occluded Front)। প্রত্যেক ধরনের সীমানাকে চিহ্ন দিয়ে আবহাওয়াবিদরা প্রকাশ করেন।

বৃষ্টি হবার ব্যাপারে বাতাসের সীমানার একটা বড় ভূমিকা আছে। অগ্রসরমান উষ্ণ সীমানা কি ভাবে বৃষ্টি আনে দেখা যাক। উষ্ণ সীমানা—
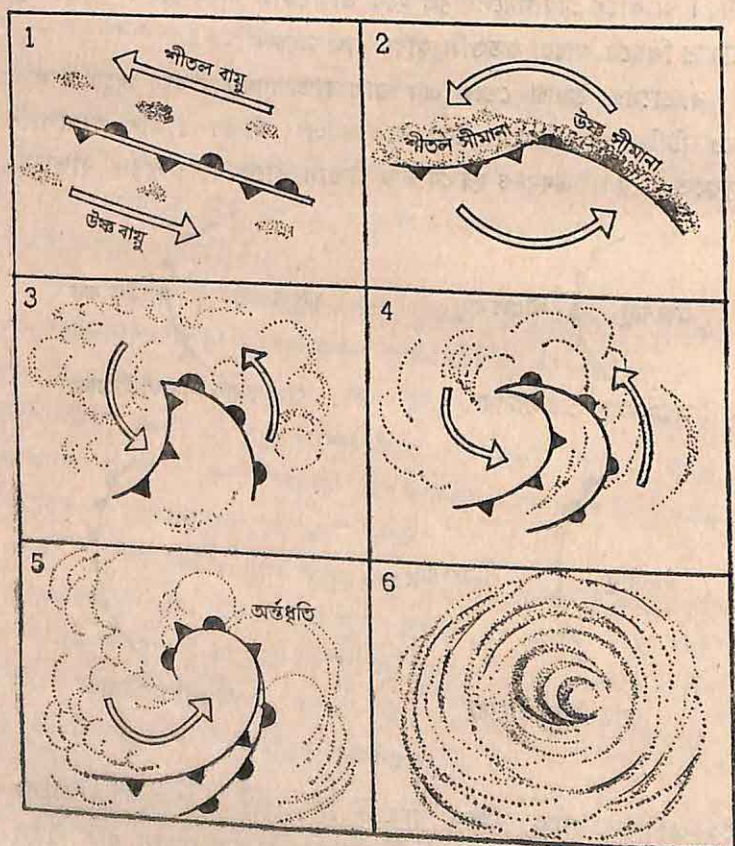
নিম্নচাপের উৎপত্তি

শীতল সীমানা রেখা বরাবর উষ্ণ বাতাস ধীরে ধীরে উপরে ওঠে, তারপর শীতল হয়ে বৃষ্টি নামায়। সীমানা রেখার নতি (gradient) নিচু, বৃষ্টির

ধরনটা হালকা ছিপছিপে। স্থানবিশেষে বৃষ্টির বদলে তুষারপাত হয়। এই ধরনের বৃষ্টি বা তুষারপাত হবার সম্ভাবনা প্রায় একদিন আগে থেকে
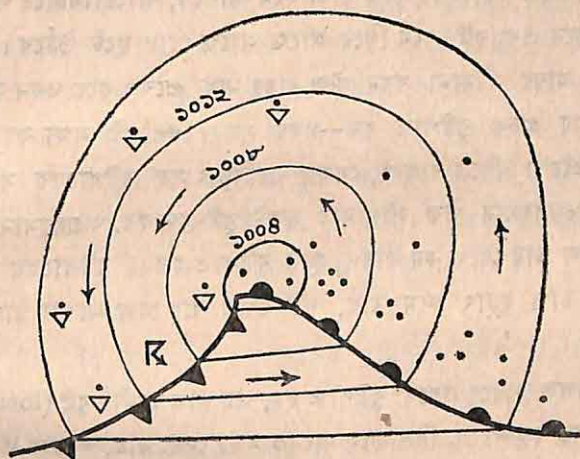
অগ্রসরমান নিম্নচাপ

বোঝা যায়। ধরা যাক, মাথার উপর ঊর্ধ্বাকাশে শুভ্র কেশ মেঘ (Cirrus cloud) ভাসছে—যা আদতে অতিশীতল জল ও বরফ কণা দিয়ে তৈরি। যদি এই মেঘ ক্রমশ মোটা হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে তাহলে বুঝতে হবে

অগ্রসরমান নিম্নচাপ

উষ্ণ সীমানা অগ্রসরমান। সময়ান্তরে দ্রুত বায়ুমণ্ডলের চাপ কমে যাবে, বাতাসের আর্দ্রতা বাড়বে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। প্রথম

দিন বৃষ্টি ঝির ঝির করে, পরে মুষলধারে পড়বে। সীমানার নতি যেখানে মাটি স্পর্শ করবে সেখানে জোর বৃষ্টি হবে। এরপর উষ্ণ বাতাসের সীমানা দর্শককে অতিক্রম করার পর বৃষ্টির ধারা কমে আসবে, ব্যারোমিটারে পারদের উচ্চতা বাড়বে এবং বৃষ্টি থেমে গিয়ে আস্তে আস্তে রোদ ফুটে উঠবে।

শীতল বায়ুর সীমানা যখন উষ্ণ বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন সীমানা নতি বরাবর প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়—সময় সময় শিলাবৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। এরকম নতিরেখা চরিত্রে খাড়াই, সেজন্য বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। অগ্রসরমান উষ্ণ সীমানায় যতটা বৃষ্টিপাত হয়, অগ্রসরমান শীতল সীমানা হলে তার থেকে কম জায়গা জুড়ে বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের আগে বাতাসের চাপ হঠাৎ কমে যায়, বৃষ্টি শেষে বায়ু চাপ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এলাকাগত কারণে কখনো বৃষ্টিপাত হয়, এর নাম স্থানীয় বৃষ্টি (localised rain)। বড় বড় শহরে, শিল্পাঞ্চলে অনেক সময় দেখা যায়, শহরের একাংশে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেল, কিন্তু অন্য অংশ শুকনো খটখটে। শহরের বাতাস ধূলিধূসরিত। গরমের দিনে শহরের সংলগ্ন নদী, জলাভূমি থেকে জলীয় বাষ্প উঠে ধুলো আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে (স্তূপ জলভরা মেঘ) এবং শেষে
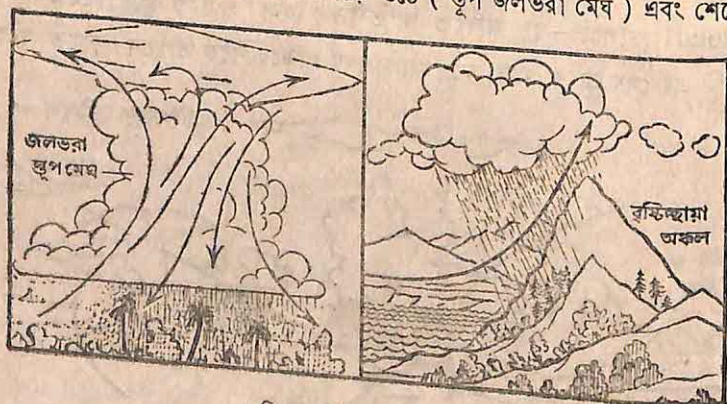
পরিচলন বৃষ্টি ও শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। শহরের বাড়িঘর রাস্তা কারখানা সব মিলে বাতাস গরম হয় এবং কাছাকাছি জলাশয় জলীয় বাষ্প সরবরাহ করে। এরকমের বৃষ্টি মুষলধারে অল্পক্ষণের জন্য হলেও তার পরিধি কম। কলকাতা শহরে প্রায়ই দেখি শ্যামবাজার, কলেজ ষ্ট্রীটে বৃষ্টি হয়ে রাস্তা ডুবে গেল কিন্তু

বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জে এক ফোঁটা বৃষ্টি হল কি হল না। এই বৃষ্টির নাম 'পরিচলন বৃষ্টি' (Convection rain)। পরিচলন বৃষ্টিতে বৃষ্টিপাত জোরে হয়, কিন্তু তার স্থায়িত্ব কম। মাঝে মাঝে বজ্রপাত সম্ভব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পরিচলন বৃষ্টি বেশি দেখা যায়। অবশ্য ইউরোপে বিকেলের দিকে পরিচলন বৃষ্টি হয়। ভূপ্রকৃতির গঠন বৃষ্টিপাতকে প্রভাবিত করে। কেরালার পশ্চিমঘাট পর্বতমালা মাথা উঁচিয়ে থাকার জন্য আরব সাগরের জোলো বাতাস পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তামিলনাড়ুতে আসতে পারে না। সেজন্য পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে বৃষ্টি হলেও পূর্ব দিকে বৃষ্টি নেই। এর নাম শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি। (Orographic rain)। বৃষ্টিবিহীন পাহাড়ের ঢালের নাম বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল (Rain shadow)।

নিম্নচাপের প্রভাবে বা সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রচুর, ঘূর্ণিঝড়ের 'চোখ' আসার আগে বাতাসের চাপ ক্রমশ কমতে থাকে, তারপর 'চোখ' চলে গেলে বাতাসের চাপ আবার বাড়তে বাড়তে স্বাভাবিক হয়ে যায়। 'চোখ' যাবার আগে অগ্রসরমান উষ্ণ সীমানার প্রভাবে এবং 'চোখ' চলে যাবার পর অগ্রসরমান শীতল সীমানার প্রভাবে বৃষ্টি হয়।

বৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণ করতে 'বৃষ্টি পরিমাপ যন্ত্র' (Rain gauge) ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটি খুবই সরল ধরনের। আজকালকার যন্ত্রের নাম
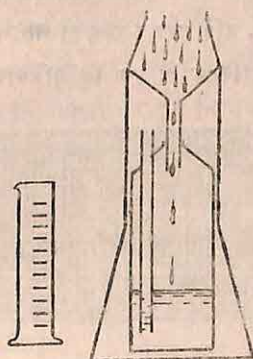
বৃষ্টি মাপা যন্ত্র

'সিমঁ-এর বৃষ্টি পরিমাপ যন্ত্র' (Simon's rain gauge)। একটা লম্বাটে গড়নের বোতলের মুখে একটা ফানেল বসানো থাকে, ফানেলের গোলাকার ব্যাসটা প্রায় তের সেন্টিমিটার লম্বা। এবার, মাটির নিচে গর্ত করে একটা

খোলা পাত্রের মধ্যে বোতলটা বসানো হয়; বোতলের উপর ফানেল রাখা হয়। মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটার উঁচুতে ফানেল থাকে। খোলা
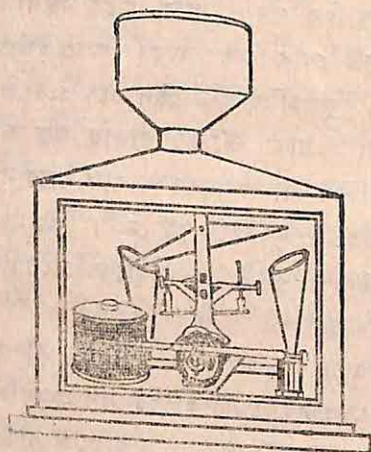
বৃষ্টি পরিমাপ যন্ত্র

মাঠে, যেখানে অবাধে বৃষ্টি পড়ে, সেইখানে গর্ত করা হয়। সারাদিন যতটা বৃষ্টির জল ফানেলের মুখ দিয়ে বোতলে পড়লো তা একটি অংশাঙ্কিত পাত্রে ঢেলে জলের উচ্চতা মাপা হয়। উচ্চতাকে মিলিমিটারে প্রকাশ করে বৃষ্টির পরিমাপ হয়। ধরা যাক, যদি জলের উচ্চতা পঁচিশ মিলিমিটার হয়, তাহলে আমরা বলবো যে সারাদিনে পঁচিশ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। স্বয়ংক্রিয়

বৃষ্টি-লেখ
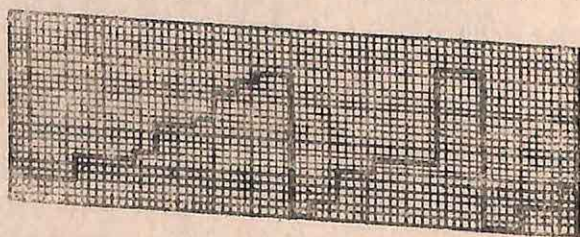
যন্ত্রের সাহায্যে ধারাবাহিক বৃষ্টিপাতের লেখচিত্র আঁকা সম্ভব। পৃথিবীতে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় মেঘালয়ে চেরাপুঞ্জীতে, বাৎসরিক ৪০০ ইঞ্চির অধিক।

উঁচু আকাশে বৃষ্টিপাত শুরু হলেও অনেক সময় সে বৃষ্টি মাটিতে পড়ে না, মাটিতে নামার আগেই নিচের বাতাসের উষ্ণতায় সে বৃষ্টি আবার জলীয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। মরুভূমিতে হামেশাই এ সব ঘটে। পারিপার্শ্বিক নানা কারণে বৃষ্টির রকমফের হয়। কখনো মুষলধারে (পরিচলন) বৃষ্টি, কখনো ঝিরঝিরে একটানা (সামগ্রিক ঘূর্ণিঝড়), কখনো ইলশেগুঁড়ি, কখনো শিলাবৃষ্টি, (কালবৈশাখী), কখনো বা বরফপাত।

বরফের গলনাঙ্কর নিচের উষ্ণতায় যে বরফ ঝরে পড়ে তা শুকনো ঝুরঝুরে—জামাকাপড় থেকে সহজেই ঝেড়ে ফেলা যায়। বাতাসের উষ্ণতা, গতিবেগ, আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর বরফের আকার কি হবে তা নির্ভর করে। যেমন নিম্নচাপের প্রভাবে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি বা ভারী বরফপাত হয়।

গ্রীষ্মের বিকালে যখন কালবৈশাখীর সঙ্গে বৃষ্টি নামে তখন মাঝে মধ্যেই শিলাবৃষ্টি হয়। ভারী ধরনের শিলাবৃষ্টিতে মাঠঘাট সাদা হয়ে যায়, মানুষ আহত হয়, গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে বড় শিলা পড়েছিল একবার উত্তর আমেরিকায়, শিলার ওজন ছিল প্রায় দেড় পাউণ্ড, ব্যাস ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। শিলাবৃষ্টি বেশিরভাগ হয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে, দেশের অন্তর্ভাগে। ছোট্ট বরফের শিলা নিচে পড়তে পড়তে বাতাসের তোড়ে উপরে উঠে যায়, সেখানে ঠাণ্ডা পরিবেশে আরো খানিকটা বরফ তার উপর জমে ওঠে। এভাবে বেশ কয়েকবার ওঠানামা করার পর শিলাটি যখন বেশ ভারী হয় তখনই মাটিতে আছড়ে পড়ে। এজন্য শিলা ভাঙলে, বার বার বরফ জমার চিহ্ন হিসাবে কতগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত শিলার ভিতর দেখা যায়।

অনাবৃষ্টির জন্য জনজীবন, অর্থনীতি মাঝে মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই বহুকাল ধরে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামাবার চেষ্টা করছেন। বহু গবেষণার পর ১৯৪৬ সালে বার্নাড ভান্নেগুট নামে একজন বিজ্ঞানী সিলভার আয়োডাইড লবণের সাহায্যে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটান। সিলভার আয়োডাইড লবণের কেলাসের বিশেষ আকার এর জন্য দায়ী। ঘন মেঘের মধ্যে এরোপ্লেনে উড়ে গিয়ে সিলভার আয়োডাইডের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে লবণ কণিকাকে কেন্দ্র করে বৃষ্টি ফোঁটা বেড়ে ওঠে এবং শেষে বৃষ্টি নামে। কিউপ্রিক সালফাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লরাইড, জমাট কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সাহায্যেও এ কাজ করা সম্ভব।

সোভিয়েত দেশে মাঝে মাঝে বনাঞ্চলে দাবানল লাগে। দাবানল নেভাবার জন্য সে দেশের বিজ্ঞানীরা বিমান থেকে মেঘে লেড আয়োডাইড আর কপার সালফেটের গুঁড়ো ছড়িয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। এসব ছড়ানোর অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘের জলকণা জমে বরফকণা-বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। শিলাবৃষ্টি ঠেকাবার জন্য কৃত্রিম উপায় খোঁজা হচ্ছে। তবে যতই গবেষণা হোক, এখনো পর্যন্ত ব্যাপকভাবে কৃত্রিম বৃষ্টি নামাবার কাজে সফলতা আসেনি। এখনো পর্যন্ত আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়।

উষ্ণতা-আর্দ্রতা

আবহাওয়ার নানা দিক বুঝতে হলে বাতাসের উষ্ণতা জানা দরকার। খোলা হাওয়ায় থার্মোমিটার বসিয়ে বাতাসের উষ্ণতা মাপা যায় না, কারণ রোদের ছোঁয়ায় থার্মোমিটারের পারদ অনাবশ্যকভাবে অনেকখানি উঠে যায়। অর্থাৎ রোদে থার্মোমিটার রাখলে আমরা রোদের উষ্ণতা পাবো,
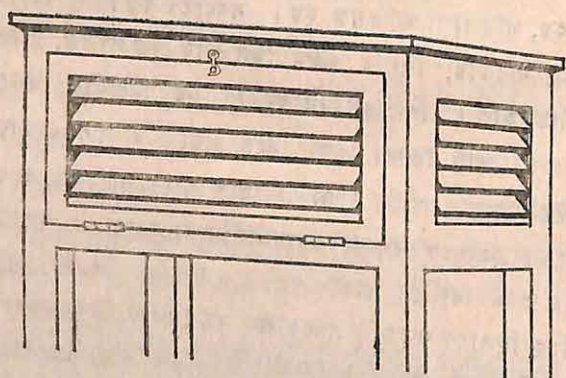
স্টিভেনসন খাঁচা

বাতাসের নয়। মাটির খুব কাছে থার্মোমিটার রাখলে মাটির উষ্ণতা পাবো। শীতকালে মাটির উষ্ণতা বাতাসের উষ্ণতার থেকে ঢের কম থাকে। সেজন্য এমন একটা ব্যবস্থা প্রয়োজন যাতে ছায়া ছায়া, খোলা এবং হাওয়াময় পরিবেশে থার্মোমিটার রাখা যায়। স্টিভেনসনের তৈরি একরকম কাঠের খাঁচায় (Stevension screen) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বন্দী করে বাতাসের উষ্ণতা মাপা হয়। স্টিভেনসনের খাঁচার রঙ সাদা, যাতে করে রোদ তাপ আলো প্রতিফলিত হতে পারে, না হলে অনর্থক উষ্ণতা বেড়ে যাবে। খাঁচার

চারদিকটা সরু সরু কাঠের রেলিং-এ ঢাকা, তার মধ্য দিয়ে হাওয়া অনায়াসে যাতায়াত করে। মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে স্টিভেনসনের খাঁচা দাঁড়িয়ে থাকে. তা না হলে মাটির আর্দ্রতা খাঁচার বাতাসের উষ্ণতাকে দেবে পাল্টে। খাঁচাটি খোলা হাওয়ায় বসানো হয়। খাঁচার ছাদটি ঢালু—বৃষ্টির জল সহজে গড়িয়ে যেতে পারে। স্টিভেনসনের খাঁচার মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা মাপার ব্যবস্থা থাকে।

সর্বোচ্চ উষ্ণতা মাপার জন্য একটি বিশেষ ধরনের থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। পারদ কুণ্ড থেকে যে কৈশিক নলটি উঠেছে, তার নীচের দিকে একটু বাঁক থাকে। এতে, একবার পারদ প্রসারিত হয়ে উঠে গেলে আর সঙ্কুচিত হয়ে নামতে পারে না। দিনের উষ্ণতা যত বাড়বে তত পারদ প্রসারিত হয়ে উঠবে, কিন্তু উষ্ণতা কমলে, পারদের আর নামা হবে না। দিনের শেষে থার্মোমিটারে পারদের অবস্থান দেখে আমরা সর্বোচ্চ উষ্ণতা বলতে পারবো।

সর্বনিম্ন উষ্ণতা মাপার জন্য রঙিন অ্যালকোহল ভরা থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। এর কৈশিক নলের মধ্যে ছোট্ট তারের কুণ্ডলী থাকে। থার্মোমিটারটিকে প্রথমে ঝাঁকিয়ে কুণ্ডলীকে সবচেয়ে উপরে তুলে নেওয়া হয়, তারপর এমনভাবে (সমান্তরাল) এটিকে শুইয়ে রাখা হয় যাতে কুণ্ডটি একটু নীচু থাকে। উষ্ণতা কমার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকোহল যেমন যেমন সঙ্কুচিত হবে, তেমনি তা ঐ তারের কুণ্ডলীটিকে টেনে নামাবে। সর্বনিম্ন উষ্ণতায় তারের কুণ্ডলী সবচেয়ে নীচে নেমে আসবে। এরপর কুণ্ডলীর অবস্থান দেখে সর্বনিম্ন উষ্ণতা বলে দেওয়া যাবে।

একটি দ্বিধাতব পাতের দু'টি ধাতুর প্রসারণের পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে 'থার্মোগ্রাফ' লেখ তৈরি হয়।

পৃথিবীতে সর্বোচ্চ উষ্ণতা পাওয়া গেছে লিবিয়ার এল-আজিজায়, ৫৮° সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতার সন্ধান মিলেছে আণ্টার্কটিকায়, –৮৮° সেন্টিগ্রেড। এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ উষ্ণতা দেখা গেছে পাকিস্তানের জাকোদাবাদে (৫৩° সেন্টিগ্রেড)।

বাতাসে জলীয় বাষ্পর একমাত্র পরিণতি বৃষ্টি নয়। আসলে বাষ্পর রূপান্তর হয় নানান ভাবে নানান দিকে। কোথাও বৃষ্টি, কোথাও কুয়াশা,

কোথাও শিশির, কোথাও বরফপাত, কোথাও বা শিলাবৃষ্টি। আমাদের চেনা জগতের শিশির—এরকমই জলবাষ্প রূপান্তরের একটি নমুনা। সকাল-বেলা শিশিরভেজা পথে চলতে কি আরাম না লাগে!

বাতাসের জলীয় বাষ্পকে ধরে রাখার ক্ষমতা অপরিসীম। শীতকালে যে বাতাসে জলীয় বাষ্প নগণ্যমাত্রায় থাকে, বর্ষাকালে সেই বাতাসই অবিশ্বাস্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধরতে পারে। তবে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বাতাসের কোন উষ্ণতায় একটি নির্দিষ্ট মাপের জলবাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে। যখন বাতাসে সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয় বাষ্প ভেসে বেড়ায়, আমরা তাকে 'সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের বাতাস' বলি। উষ্ণতা কমে গেলে বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরে রাখার ক্ষমতাও কমে যায়।

এখন ধরা যাক, কোন একদিন বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে, তা সম্পৃক্ত হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এবার, বাতাসের উষ্ণতা যদি কমানো যায়, তাহলে নিশ্চয় কোন এক নিম্ন উষ্ণতায় এসে বাতাস উপস্থিত জলীয় বাষ্প দিয়েই সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে। এই যে উষ্ণতা, অর্থাৎ যখন বাতাস জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত হবে, তাকে আমরা 'শিশিরাংক' (Dew point) বলি।

শিশিরাংক প্রসঙ্গে আর্দ্রতার কথা এসে পড়ে। বাতাসে কতটা জলীয় বাষ্প আছে তা মাপা হয় দু'ভাবে: চরম আর্দ্রতা (Absolute humidity) এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity)। কোন নির্দিষ্ট আয়তনের বাতাসে যতটা জলীয় বাষ্প থাকে, তাকে চরম আর্দ্রতা বলে। সাধারণত চরম আর্দ্রতাকে 'গ্রাম প্রতি কিউবিক মিটার' এককে প্রকাশ করা হয়।

আবহাওয়াবিদরা বাতাসের আর্দ্রতাকে 'আপেক্ষিক আর্দ্রতায়' প্রকাশ করেন। কোন নির্দিষ্ট আয়তনের বাতাসে কোন বিশেষ উষ্ণতায় যতটা জলীয় বাষ্প আছে, তার ওজন এবং ঐ আয়তনের বাতাসকে যতটা জলীয় বাষ্প ঐ উষ্ণতায় সম্পৃক্ত করতে পারে, তার ওজনের অনুপাতকে 'আপেক্ষিক আর্দ্রতা' বলে।

$$\text{আপেক্ষিক আর্দ্রতা} = \frac{\text{পারিপার্শ্বিক উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট আয়তনের—}}{\text{পারিপার্শ্বিক উষ্ণতায় ঐ আয়তনের বাতাসকে—}} \frac{\text{বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর}}{\text{সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাষ্পের ভর}}$$

$$= \frac{\text{পারিপার্শ্বিক উষ্ণতায় বাতাসে উপস্থিত জলীয়-বাষ্পর চাপ}}{\text{পারিপার্শ্বিক উষ্ণতায় বাতাস সম্পৃক্ত করার জন্য-প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের চাপ}}$$

$$= \frac{\text{শিশিরাংকে সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ}}{\text{পারিপার্শ্বিক উষ্ণতায় সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ}}$$

আপেক্ষিক আর্দ্রতাকে সাধারণত শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন,

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা মাপ) =

$$\frac{\text{শিশিরাংকে সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ}}{\text{পারিপার্শ্বিক উষ্ণতায় সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ}} \times ১০০$$

আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকার অর্থ—বাষ্পায়ন দ্রুত হবে। কত তাড়াতাড়ি জল বাষ্প হচ্ছে তাই দেখে আমরা একটি স্থানের আবহাওয়ার আর্দ্রতা বা শুষ্কতা নির্ণয় করি। আর্দ্র দিন যে আমাদের কাছে অসহ্য তার কারণ সোজা। বেশি আর্দ্রতা মানে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি, অতিরিক্ত বাষ্পই চারদিকের গুমোটভাবের জন্য দায়ী। শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে বলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়, ভিজে জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয়, গায়ের চামড়া শুকনো খসখসে হয়, কখনো ফেটে রক্ত পড়ে। বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতা মানে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আর্দ্র আবহাওয়া কতগুলি ট্রপিকাল চর্মরোগের কারণ, আর্দ্র আবহাওয়ায় গাছপালা খুব বাড়ে। যে সব জনগোষ্ঠী আর্দ্র আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল বাস করে তাদের চলাফেরা হাবভাবের কতগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, এসব জনগোষ্ঠীর মানুষদের মুখশ্রী সাধারণভাবে নরম ও কমনীয় হয়। বাঙালীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে। এই সব নানা কারণে আবহাওয়াবিদরা আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্পর্কে জানতে চান। আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাপার জন্য 'সিক্ত ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটার' (Wet and Dry bulb hygrometer) বা Psychrometer ব্যবহার করা হয়।

সিক্ত ও শুষ্ক বাল্ব হাইগ্রোমিটারে একটি কাঠের পাটাতনের গায়ে দু'টি থার্মোমিটার পাশাপাশি বসানো থাকে। এর মধ্যে একটি থার্মোমিটারের

পারদকুণ্ড খোলা বাতাসে (আসলে স্টিভেনসনের খাঁচায়) থাকে বলে তা বাতাসের উষ্ণতা মাপে। অন্য থার্মোমিটারের পারদকুণ্ডটির গায়ে একটি ভিজা মসলিন কাপড় জড়ানো থাকে। মসলিন কাপড়টা যাতে শুকিয়ে না যায় তার জন্য মসলিন কাপড়ের সঙ্গে জড়ানো একটা পলতে বাটিভর্তি জলের মধ্যে ডোবানো থাকে। জল পলতে ধরে চুঁইয়ে উঠে মসলিন কাপড় সব সময় ভিজিয়ে রাখে। মসলিন থেকে বায়ুর আর্দ্রতা অনুযায়ী জল সব সময় বাষ্পীভূত হয়, পারদকুণ্ড থেকে বাষ্পীভবনের লীন তাপ টেনে নেওয়া হয়, এজন্য সিক্ত বাল্বের থার্মোমিটারে পাশের থার্মোমিটার থেকে কম উষ্ণতা দেখা যায়। দুই থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্য থেকে আমরা বাতাসের আর্দ্রতা সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারি। যেমন, কোন শুষ্ক দিনে (কম আর্দ্রতা) মসলিন থেকে জল দ্রুত বাষ্পীভূত হবে, সিক্ত থার্মোমিটারের উষ্ণতা বেশ কমে যাবে, দুটি থার্মোমিটারের উষ্ণতার পার্থক্যও হবে বেশি। তেমনি খুব ভ্যাপসা দিনে, বাতাসে যখন খুব জলীয় বাষ্প থাকে তখন সিক্ত বাল্বে বাষ্পীভবন কম হয়, দু'টি থার্মোমিটারে উষ্ণতার পার্থক্যও হয় অল্প।
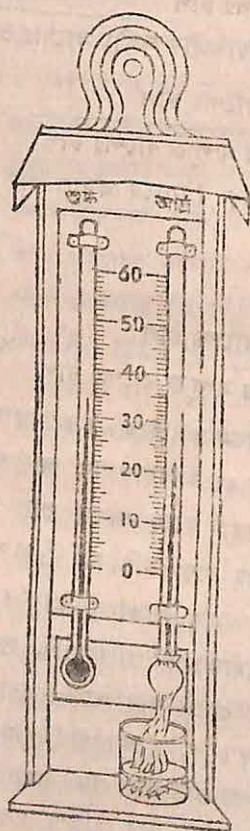
হাইগ্রোমিটার

সিক্ত ও শুষ্ক বাল্ব থার্মোমিটারের দু'টি উষ্ণতা ও গ্লাইসারস ফ্যাক্টরের (Glaisher's Factor) সাহায্যে আমরা প্রথমে শিশিরাংক নির্ণয় করি। শিশিরাংক উষ্ণতায় ও শুষ্ক বাল্বের উষ্ণতায় সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ কত, তা আমরা 'রেনোর সারণীতে' পাই। বিজ্ঞানী হেনরি ভিক্টর রেনো গত শতাব্দীতে বিভিন্ন উষ্ণতায় সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পের চাপ নির্ণয় করে তা

লিপিবদ্ধ করেছিলেন, ঐ লিপির নাম 'রেনোর সারণী'। দু'টি সম্পৃক্ত বাষ্পের চাপ থেকে সহজেই আপেক্ষিক আদ্র'তা নির্ণয় করা সম্ভব।

অনেকদিন আগে মানুষের মাথার চুল দিয়ে একরকম হাইগ্রোমিটার তৈরি করা হয়েছিল—এর নাম 'হেয়ার হাইগ্রোমিটার'। বাতাসের আদ্র'তা যত বাড়ে তত চুল দৈর্ঘ্যে প্রসারিত হয়, চুলের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে হেয়ার হাইগ্রোমিটার বানানো হয়েছিল।

শিশির-কুয়াশা-ধোঁয়াশা

শরতের সকালে শিশিরভেজা ঘাসের পথে চলতে কি ভালোই না লাগে। মুক্তোর মতো শিশিরের বিন্দু, তার মধ্যে ধরা থাকে একটি নিটোল সূর্য! চোখ ফেরালে তাতে লাল, নীল, সবুজ কত রঙের বাহার দেখা যায়। তারপর বেলা বাড়তে না বাড়তেই ভেজা ঘাস শুকিয়ে ওঠে, যে হালকা কুয়াশা প্রান্তর ঢেকেছিল তা মিলিয়ে গেল রোদের স্পর্শে।

বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তা আমাদের জানা। একটা কাচের গ্লাসে বরফ মেশানো জল রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে গেলাসের বাইরের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল জমে ওঠে। কোথা থেকে এলো এরা? ঠাণ্ডা শীতল গেলাসের গায়ে লেগে থাকা বাতাসের বাষ্প জমে গিয়ে ফুটে উঠেছে ঐ কাচের গায়ে। ঠিক এমনটি ঘটে শিশিরের বেলায়। ঠাণ্ডা রাতে ঘাসের ডগা, গাছের পাতা, টিনের চাল তাপ হারাতে হারাতে ভারী ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর তখন বাতাসের জলবাষ্প ঐ শীতল ঘাসের ডগায় জমে বিন্দু বিন্দু ফুটে ওঠে। ঘুম থেকে উঠে দেখি, সকালের সব মাধুর্য জমা আছে ঐ ঘাসের শীষে। অনেকের ধারণা, বৃষ্টির মতো বুঝি শিশির পড়ে আকাশ থেকে। তাই 'শিশির পড়া' শব্দটি চালু আছে। তা কিন্তু নয়। বরং আমাদের বলা উচিত—শিশির পড়ে না, শিশির জমে।

তবে শিশিরের ফোঁটা জমে জমে শেষে এক সময় গড়িয়ে পড়ে। মাঝ-রাতে টিনের চাল বেয়ে বা গাছের পাতা বেয়ে শিশিরের জল পড়া অনেকেই দেখেছে।

বাতাসের উষ্ণতা কমতে কমতে শিশিরাংকে পৌঁছালে বাতাস জলীয় বাষ্প দিয়ে সম্পৃক্ত হবে। এরপর আর একটু উষ্ণতা কমলেই অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প জমে শিশির হয়ে যায়। তাহলে শিশির পড়তে হলে দু'টো

জিনিস প্রয়োজন। এক, বাতাসে বেশ জলীয় বাষ্প থাকা চাই। দুই, বাতাসের উষ্ণতা কম চাই। এজন্য গরমের সময়ে বা শুখা অঞ্চলে তেমন শিশির পড়ে না।

শিশিরের কথা উঠলে কুয়াশার কথা মনে আসে। শীতকালে শেষ রাতে বাতাসের উষ্ণতা কমে শিশিরাংকের নিচে নেমে এলে জলীয় বাষ্প জমে ভারী সূক্ষ্ম-জলকণা বাতাসে ভাসতে থাকে। একরাশ বাতাসে ভাসমান জল-কণাকে আমরা অস্বচ্ছ ধোঁয়ার মতো দেখি—এর নাম কুয়াশা। বাতাসে ধূলিকণা, কার্বন কণা ভাসমান থাকলে তাদের গায়ে জল জমে গিয়ে ভারী কুয়াশা তৈরি করে—একে অনেকে 'ধোঁয়াশা' বলেন। শহরে, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চলে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ধোঁয়াশা দেখা যায়। ধোঁয়াশার কার্বন, ধূলিকণা আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, ধোঁয়াশায় চোখ জ্বালা করে। কলকাতা শহরে ধোঁয়াশার উপদ্রব বাড়তে বাড়তে আজ জনস্বাস্থ্য-সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

শীতের সকালে নিঃশ্বাস ফেললে বা মুখ দিয়ে বাতাস বের করলে ধোঁয়ার মতো দেখায়, সকালে পুকুরের জলের উপর অস্বচ্ছ জলবাষ্প দেখা যায়। এ সবই হল ঘনীকৃত জলকণার স্তূপ, কারণ ঐ একই।

শীতের রাতে আকাশে মেঘ না থাকলে রাতে শীত বাড়ে এবং খুব বেশি শিশির জমে। মেঘমুক্ত আকাশপথে পৃথিবী থেকে তাপ বেরিয়ে যায়—ফলে পৃথিবী বেশ তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। আকাশে মেঘ থাকলে অবশ্য পৃথিবীর তাপ ভালোভাবে বের হতে পারে না, রাত হয় কম ঠাণ্ডার, কিছুটা গরম বোধ হয়। সকাল বেলা ঘাসের উপর অল্প শিশির দেখা যায়।

যদি বিকিরণের পথে তাপের ঊর্ধ্বাকাশে পালাবার উপায় থাকে এবং সারারাত হালকা বাতাস প্রবাহিত হয় তবে সকালবেলা আমরা ঘন কুয়াশা দেখি। কুয়াশার মধ্যে পথ ঘাট বাড়ি—সব হারিয়ে যায়। এর নাম 'বিকিরণ কুয়াশা' (Radiation fog)। শহরে বা কারখানার কাছাকাছি বাতাসে অবশ্য এই কুয়াশা খুব ভারী ধরনের হয়। হালকা বায়ুপ্রবাহ মাটির কাছের শীতল বাতাসকে চারদিকে, উপরে, পাশে ছড়িয়ে দেয়, তারজন্য একটা ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে শীতলতা নেমে আসে, কুয়াশাও ছড়ায় চারদিকে। বিকিরণ কুয়াশা পাবার জন্য দীর্ঘ শীতের রাত, মেঘহীন

আকাশ, উচ্চ আপেক্ষিক আদ্র´তা, মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ ও উচ্চ বায়ুচাপ

নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি .... বৃষ্টি ও বরফপাত
মাঝে মাঝে বৃষ্টি .... শিলা বৃষ্টি
ঝির ঝিরে বৃষ্টি .... প্রবল বৃষ্টি
বজ্রপাত .... কুয়াশা
বরফপাত .... সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়

প্রতীক চিহ্ন

প্রয়োজন। যদি বাতাসের প্রবাহ মৃদুমন্দ না হয়ে জোরালো হয়ে পড়ে তাহলে এক্ষেত্রে কুয়াশার বদলে নিচ আকাশে মেঘ দেখা দেয়।

হেমন্তকালে বিকালে আমাদের সবার একটা অভিজ্ঞতা হয়। দেখা যায়, খোলা মাঠে ধান ক্ষেতে মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে সাদা ধোঁয়া আটকে
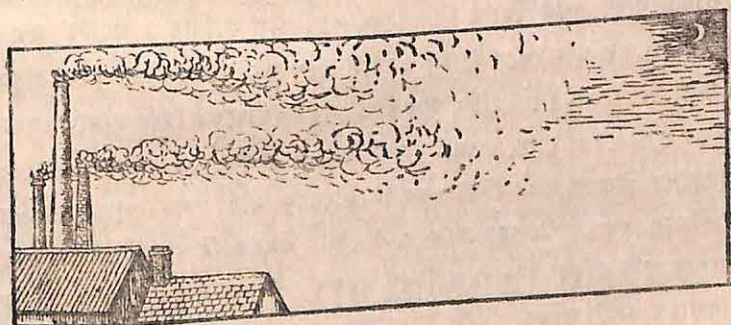
উষ্ণতা-বৈপরীত্য

আছে। বহুক্ষণ এক জায়গায় ঐ সাদা ধোঁয়া আটকে থাকে। এর কারণ কি? হেমন্তকালের সন্ধ্যাবেলায় মাটির কাছাকাছি বাতাস তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে যায়, কিন্তু উপরের বাতাস ঠিক মতো ঠাণ্ডা হতে পারে না। মাটি যত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়, উঁচু দিকের বাতাস তত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে পারে না, তাই মাটির লাগোয়া বাতাস আগেভাগেই শীতল হয়ে যায়। এর ফলে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা কমার বদলে, বলতে পারি—উষ্ণতা বাড়ে। একে 'উষ্ণতা-বৈপরীত্য' (**Temperature Inversion**) বলা হয়।

মাটির কাছে বাতাস শীতল বলে ওখানে কুয়াশা জমে ওঠে, তার সঙ্গে এসে যোগ দেয় গৃহস্থের রান্নাঘরের ধোঁয়া। এই ধোঁয়া নিচের বাতাস ঠাণ্ডা বলে সেখানে আটকে থাকে, দীর্ঘসময় পরে অবশ্য আস্তে আস্তে ঐ ধোঁয়া উর্ধ্বাকাশে মিশে যায়। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় শীতের সন্ধ্যায় কোন কোন দিন ধোঁয়াশা হয়, কোন দিন হয় না। যদি ভূমি থেকে কিছু উপরে উষ্ণতা বৈপরীত্যের জন্য বেশি ঠাণ্ডা থাকে, বাতাস প্রবাহিত না হয় তাহলে ভূমিস্থ ধোঁয়াশা পালাবার পথ পাবে না ; অন্যথায় ধোঁয়াশা উর্ধ্বাকাশে পালিয়ে যাবে। কলকাতায় এ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের আছে।

শিশির পড়ার পর যদি কোন কারণে বাতাসের উষ্ণতা জলের হিমাংকের (শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) নিচে নেমে যায় তাহলে শিশির জমে যাবে। গাছের পাতায় ঘাসে বরফ জমবে। এর নাম সিলভার ফ্রস্ট (Silver frost)। সিলভার ফ্রস্টের জন্য চাষবাসের খুব ক্ষতি হয়, ইউরোপে প্রতি বছর এভাবে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়। ভূমির সংলগ্ন জল, ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে জলকাদা যখন ঠাণ্ডা রাতে জমে ওঠে, আমরা তাকে ভূমিজ ফ্রস্ট (Ground frost) বলি, ভূমি থেকে বিকিরণের পথে তাপ হারিয়ে এ ফ্রস্টের জন্ম। কখনো বা অন্য স্থান থেকে শীতল বাতাস এসে ফ্রস্ট জমায়—এর নাম বায়ুজ ফ্রস্ট (Air frost)। মাটির উষ্ণতা জলের হিমাংকের নিচে নামলে যেমন ভূমিজ ফ্রস্ট দেখা দেয়, তেমনি মাটি থেকে অন্তত ফুট চারেক উপরের বাতাসের উষ্ণতা যখন হিমাংকের নিচে নেমে যায় তখন বায়ুজ ফ্রস্টের আবির্ভাব হয়। শীতের দেশে ফ্রস্ট যেমন ফসলহানি ঘটায়, তেমনি সময় বিশেষে ফ্রস্ট জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দেয়। শীতের দেশে ফ্রস্টের যেমন কৃষিকাজে একটা ভূমিকা আছে, আমাদের দেশে তেমনি কৃষিতে কুয়াশার ভূমিকার কথা সুবিদিত। কুয়াশার আবির্ভাবে কোন কোন ফসলের ক্ষতি, কারো লাভ। তবে, সাধারণভাবে কুয়াশা নানা বিপত্তি ডেকে আনে। যেমন, বিমান, রেল, পথ পরিবহণের কাজে কুয়াশার বাধার কথা আমরা জানি। বিমান বন্দরের কুয়াশা বিমান চলাচল ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ করে দেয়। উন্নত দেশে কৃত্রিম উপায়ে কুয়াশা-ধোঁয়াশা ধ্বংস করার ব্যবস্থা আছে। ইদানীং বিমান বন্দরে কুয়াশার মধ্য দিয়ে অতিশব্দ (Ultra sound) অর্থাৎ যে শব্দ তরঙ্গে সাধারণ শব্দ থেকে বেশি মাত্রায় কম্পাঙ্ক থাকে, তা পাঠিয়ে কুয়াশার জল ঝরানো হয়। কখনো শুখা বরফের গুঁড়া

(কঠিন আকারের কার্বন-ডাইঅক্সাইড) ছড়িয়ে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি নামানো হয়, কুয়াশা ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। এভাবে পনের থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে বড় বড় বিমান বন্দর কুয়াশাশূন্য করা হয়।

আকাশে বাতাসে ভাসমান জলের কণা কত রকম সুন্দর দৃশ্যের জন্য দায়ী ; তাদের মধ্যে প্রথমেই রামধনুর নাম করতে হয়। সকাল বা বিকালে বৃষ্টিশেষে সূর্যের আলো ফুটে উঠলে সূর্যের বিপরীত আকাশে রামধনু দেখা দেয়। ভাগ্য থাকলে, পর পর দু'টি রামধনু দেখা সম্ভব। সূর্যের আলো যে সাত রঙের মিশেল তা কে না জানে। এই সাতটি রঙ হল—বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। আকাশে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলে সারা আকাশ জুড়ে ছোট ছোট জলকণা ভাসতে থাকে। সূর্যের সাদা আলো এসব জলকণার মধ্যে ঢুকে বিচ্ছুরিত এবং সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ প্রতিফলিত হয়ে বিপরীত আকাশের জমিতে ফুটে ওঠে। বৃষ্টি হল, তারপর সূর্য উঠলো—এতেই রামধনুর দেখা মিলবে না। আকাশের কোথায় সূর্য আছে তা জানা দরকার। সূর্য যদি ভূমি থেকে ৪১° কোণের থেকে বেশি উপরে থাকে তাহলে আর রামধনু দেখতে হচ্ছে না।

রামধনুর মতো আর একটি সৌন্দর্য হচ্ছে চাঁদের ও সূর্যের শোভা। বর্ষা-কালের চাঁদনী রাতে চাঁদের এবং দিনের বেলায় সূর্যের শোভা কে না দেখেছে! অনেকে আবার চাঁদের শোভাকে বৃষ্টির পূর্বাভাষ বলে মনে করেন। এ সব শোভার পেছনে ঊর্ধ্বাকাশের জলকণার হাত আছে। পাতলা কেশস্তর মেঘ (Cirrostratus) যদি উঁচু আকাশে ভাসে এবং তার মধ্যে যদি বরফের কুচি থাকে তাহলে সূর্য বা চাঁদের চারপাশে সাদা সাদা ধোঁয়া ধোঁয়া বলয় দেখা যায় ; বরফ কুচির বদলে যদি জলকণার প্রাচুর্য থাকে তাহলে অবশ্য সেই জলকণাগুলি আলো বিচ্ছুরণ করে সাতরঙা আলোর বলয় তৈরি করে। চাঁদের বা সূর্যের শোভার সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশের জলকণার সম্পর্ক আছে বলে এগুলি কখনো কখনো বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাষ মনে করা যেতে পারে।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ

গরমের পর বর্ষা, তারপর শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত—তারপর আবার গরম। কেমন চমৎকার নিয়ম মেনে আমাদের ঋতুগুলি ফিরে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে একটু তাড়াতাড়ি বা দেরি করে আসে বা যায়—এই যা অনিয়ম। ঋতু বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানিয়ে শুধু মানুষই যে জীবন নির্বাহ করে তাই নয়, অন্য পশুপাখী, গাছপালা, এমনকি ভূ-বৈচিত্র্যও ঋতুর উপর নির্ভরশীল। ঋতু পরিবর্তনের মূল কারণ পৃথিবীর বাৎসরিক গতি।

পৃথিবী সূর্যের চারপাশে যে পথে ঘুরে আসে, সেই পথ যে সমতলে আছে তাকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ তল বলে। পৃথিবী যে কাল্পনিক রেখার চারপাশে ঘুরপাক খায়, সেই অক্ষ প্রদক্ষিণ তলের উপর লম্বভাবে থাকে না, সাড়ে তেইশ ডিগ্রী হেলে থাকে। বাৎসরিক পরিভ্রমণে পৃথিবীর উপর সূর্যকিরণের আনুপাতিক পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলনই হল ঋতু পরিবর্তন।

ঋতুবৈচিত্র্য

সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী যখন 'ক' অবস্থানে থাকে সূর্য তখন বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। বিষুব রেখা থেকে যত উত্তর বা দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাবে, তত সেখানে সূর্যের তাপ তির্যকভাবে পাওয়া যাবে। এজন্য স্থানবিশেষের অক্ষাংশ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম কমবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় লণ্ডন শহরের উষ্ণতা দিল্লী থেকে কম হবে, কারণ লণ্ডনের অক্ষাংশ দিল্লী অপেক্ষা বেশি।

এরপর পৃথিবী 'খ' অবস্থানে এলে সূর্য ২৩½° দক্ষিণ অক্ষাংশ অর্থাৎ মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়, তখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্ম ও উত্তর গোলার্ধে শীত। দক্ষিণ মেরু এলাকায় তখন চব্বিশ ঘণ্টাই শুধু দিন, উত্তর মেরুতে নিরবিচ্ছিন্ন রাত। সূর্য উত্তর গোলার্ধে ভীষণভাবে হেলিয়ে কিরণ দেয়। আমাদের দেশে শীতকালের মধ্যাহ্নপুরেও সূর্য দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে তির্যক ভঙ্গীতে কিরণ দেয়, বিকালের ছায়া দীর্ঘতর হয়।

এরপর পৃথিবী এগিয়ে 'গ' অবস্থানে এলো। 'গ' অবস্থানে পৃথিবী

এলে সূর্য আবার বিষুব রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দিতে শুরু করে, উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিনরাত সমান হয়ে যায়। তারপর পৃথিবী 'ঘ' অবস্থানে এলে সূর্য ২৩½° উত্তর অক্ষাংশ বা কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে রশ্মি দিতে শুরু করে, উত্তর গোলার্ধে গরমকাল আর দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল দেখা দেয়। স্বভাবতই তখন উত্তর গোলার্ধে দিন বড় রাত ছোট এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন ছোট রাত বড়, উত্তর মেরুতে চব্বিশ ঘণ্টা দিন—দক্ষিণ মেরুতে চব্বিশ ঘণ্টা রাত। অক্ষাংশ যত বাড়ে দিন রাতে ফারাকও বাড়ে। যেমন 'ঘ' অবস্থানে, লণ্ডন শহরে যত বড় দিন, দিল্লীতে তত বড় নয়, আবার লণ্ডনে রাত যত ছোট দিল্লীতে তত ছোট নয়। বলতে গেলে, একমাত্র কর্কটক্রান্তি রেখার উপর অবস্থিত কোন শহরে, যেমন কৃষ্ণনগরে প্রচণ্ড দাবদাহ সহ্য করতে হয় আমাদের।

'ক' ও 'গ' অবস্থানে পৃথিবী আসে যথাক্রমে ২২শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে মার্চ। এদের নাম 'সমরাত্রি দিবস' (Equinoxe)। 'খ' অবস্থানে পৃথিবী আসে ২২শে ডিসেম্বর (winter solstice) এবং 'ঘ' অবস্থানে পৃথিবী আসে
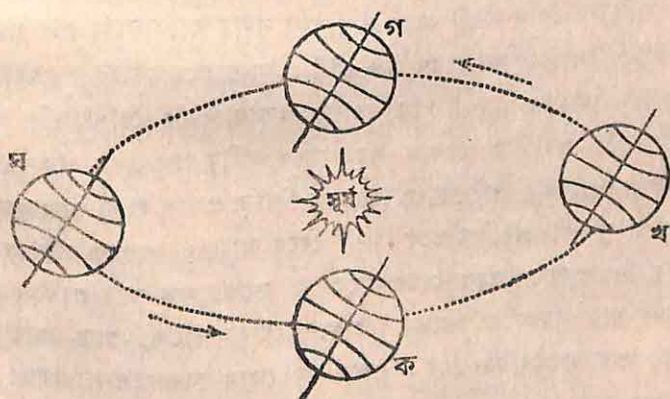
পৃথিবীর সূর্য পরিভ্রমণ

২১শে জুন (summer solstice)। ২১শে সেপ্টেম্বর ও তার কাছাকাছি দিনগুলি শরৎকাল, ২১শে মার্চ এবং তার আশেপাশের দিনগুলি বসন্তকাল বলা হয়। ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের অধিক অক্ষাংশ বিশিষ্ট স্থান ও ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশের অধিক অক্ষাংশযুক্ত স্থানের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই স্থানে বছরের কোন না কোন সময়ে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা দিন বা রাত দেখা

যাবে। ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের উপরের অঞ্চলকে 'সুমেরু বৃত্ত' (Arctic Circle) এবং ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশের উপরের অঞ্চলকে 'কুমেরু বৃত্ত' (Antarctic Circle) বলে।

খুব মজার ব্যাপার যে ২১শে জুন উত্তর মেরুতে সূর্যকে সারাদিনের জন্য ভূমি থেকে ২৩½° উপরে দর্শককে কেন্দ্র করে ঘুরতে দেখা যাবে, ঠিক এমনই দেখা যাবে দক্ষিণ মেরুতে ২২শে ডিসেম্বরে। যত দিন যাবে (২১শে জুন থেকে) তত সূর্য উত্তর মেরুতে মাটির কাছে নেমে আসবে এবং ২২শে সেপ্টেম্বরে ঠিক ভূমির তল বরাবর (দিকচক্রাবালে) একটি বৃত্তপথে ঘুরবে, ২২শে সেপ্টেম্বরের পর আর উত্তর মেরু থেকে সূর্য দেখা যাবে না, আসবে নিরবিচ্ছিন্ন রাত্রি। অনুরূপভাবে ২২শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে দক্ষিণ মেরুতে সূর্যোদয় হবে, ক্রমে সূর্য দিকচক্রাবাল ছেড়ে উঠে আসবে এবং ২২শে ডিসেম্বর সর্বোচ্চ স্থানে (২৩½°) উঠে আসবে। ২২শে ডিসেম্বরের পর শুরু হবে দক্ষিণ মেরুতে সূর্যের নামার পালা। ২১শে মার্চ আবার দিকচক্রাবাল ছুঁয়ে সূর্য দক্ষিণ মেরুতে ছ'মাসের জন্য অস্ত যাবে।

পৃথিবীর কোন একটি অংশে সারাবছর সমান তালে সূর্যের তাপ পড়ে না —ঋতু পরিবর্তনের মূল কারণ কিন্তু এটিই। উষ্ণতার হেরফেরের জন্য বাতাসের চলাচলে তারতম্য দেখা যায়, তাতে ঋতুবৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আরো ফুটে ওঠে। প্রবাহিত বাতাস সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প টেনে এনে বৃষ্টিপাত, বরফপাত ঘটায়। তাইতো প্রাণের এত বিচিত্র প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয়েছে। ভাগ্যি, পৃথিবী প্রদক্ষিণ তলে ২৩½° হেলে আছে! প্রসঙ্গত বলি, শুক্রগ্রহ কিন্তু তার প্রদক্ষিণ তলে হেলে থাকে না, শুক্রের অক্ষ তার প্রদক্ষিণ তলের সঙ্গে প্রায় লম্বভাবে আছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, শুক্রে আর যাই ঘটুক তার ঋতুবৈচিত্র্য নেই। তার যে কোন অক্ষাংশে সারাবছর একই মাপের তাপ পায়।

পৃথিবীর মাটিতে সূর্যতাপের তারতম্যের ভিত্তিতে জলবায়ুকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(এক) নিরক্ষীয় জলবায়ু। বিষুব রেখার দু'পাশে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মাঝামাঝি ব্যাপক অঞ্চলকে নিরক্ষীয় জলবায়ুর অঞ্চল বলে। এখানে সারাবছরই কম বেশি লম্বভাবে সূর্যকিরণ পড়ে। গরম

বেশি, বৃষ্টিপাতও বেশি, এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহের রঙ তামাটে-পোড়াপোড়া, প্রায় কালো বলা যায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বনভূমি গভীর এবং দীর্ঘ বনস্পতিতে সজ্জিত। এসব বনে হরেকরকম প্রাণী দেখা যায়, পোকামাকড় কীটপতঙ্গের সংখ্যাও কম নয়। সংক্রামক রোগ, ব্যাকটেরিয়া-জাত রোগ ইত্যাদি বেশি করে এসব অঞ্চলে দেখা যায়, যাদের এক কথায় 'নিরক্ষীয় ব্যাধি' (Tropical disease) বলে।

(দুই) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং মকরক্রান্তি রেখা থেকে ৬৬½° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত—দু'টি ব্যাপক অঞ্চলকে আমরা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বলি। এসব জায়গায় সূর্য সব সময় তির্যকভাবে কিরণ দেয়। তার জন্য আবহাওয়ায় গরমের আধিক্য নেই, বরং শীতের দাপটটাই কিছু বেশি। ইউরোপের আবহাওয়া জলবায়ু ঠিক এই রকম। এসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি নয়, গাছ-পালার ঘনত্বও কম।

(তিন) মেরুদেশীয় জলবায়ু। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অর্থাৎ যে অঞ্চলে বছরে কোন না কোন সময়ে একাদিক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা দিন বা চব্বিশ ঘণ্টা রাত থাকে, সেখানে মেরুদেশীয় জলবায়ু দেখা যায়। মেরুদেশীয় জলবায়ুতে স্বভাবতই শৈত্যের প্রকোপ বেশি, গাছপালা প্রায় নেই—বসন্তে তুন্দ্রা অঞ্চলে কিছু আগাছা জন্মায় মাত্র। এ সব স্থান মানুষের বাসযোগ্য নয়, মানুষ ছাড়া শ্বেতভল্লুক, সীল, পেঙ্গুইন এরকম কিছু প্রজাতি বাস করে।

কোন্ অঞ্চলের জলবায়ু কেমন হবে তা শুধু মাত্র ঐ স্থানের অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে না। বাতাসের গতিবেগ ও দিক, ঐ স্থানের সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা, স্থানটি সমুদ্রের তীরদেশে আছে না স্থলভাগের ভেতরে আছে —তার উপরও জলবায়ু নির্ভর করে। তাই একই অক্ষাংশের উপর থেকেও দু'টি স্থানের জলবায়ু ভিন্ন হতে পারে। যেমন, বোম্বাই শহর ও নাগপুর শহর মোটামুটি একই অক্ষাংশে (নাগপুরের অক্ষাংশ সামান্য বেশি) থাকা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ে শীত কম, নাগপুরে শীত বেশি, বোম্বাইয়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে নাগপুরের থেকে বেশি বৃষ্টি হয়। তেমনি আবার সমুদ্র বেষ্টিত কোন দ্বীপে সারাবছরই মাঝারি উষ্ণতা দেখা যায়। দ্বীপের জলবায়ু এমন হতে পারে যে সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রাণীর বাস করা সম্ভব।

যেমন সম্ভব হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের গালাপাগোস দ্বীপে, নানা ধরনের প্রাণী এখানে বাস করে।

এক একটা বড় পাহাড় কি রকম জলবায়ুতে পার্থক্য ঘটায় তা বলি। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কেরালা এবং তামিলনাড়ুর জলবায়ুতে বিস্তর পার্থক্য ঘটিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুকে পর্বতমালা আটকে দিয়ে কেরালাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়, কিন্তু পাহাড়ের পূর্বদিকে অর্থাৎ তামিলনাড়ুতে তেমন বৃষ্টি হয় না। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমদিকে যেখানে ঘন বন, নারিকেল বীথি, পূর্বদিক কিন্তু নিষ্করুণ, প্রায় পতিত জমি। এসব নানা স্থানীয় কারণে কোথাও মরুভূমি, কোথাও তৃণভূমি, কোথাও মৌসুমী বায়ু, কোথাও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু।

জলবায়ুর উপর কৃষিকাজ, বনসৃজন, মানুষের স্বাস্থ্য স্বভাব সংস্কৃতি নির্ভর করে। প্রাচীন নরগোষ্ঠীগুলির জীবনযাত্রা ভীষণরকম জলবায়ু নির্ভর। এস্কিমোরা বাস করে বরফের ঘরে ইগলুতে, বেদুইনরা ঘোড়ায় চড়ে আরবের মরুতে ঘুরে বেড়ায়, পিগমীরা ছোট ছোট কুঁড়ে গড়ে তোলে। জলের দেশের মানুষ মাছ খেতে ভালোবাসে, ভারতীয়রা চীনারা খায় ভাত, পাঞ্জাবীরা রুটি। আবার আফ্রিকার মাসাই উপজাতির লোকেরা বিরুদ্ধ জলবায়ুতে চাষবাস করতে পারে না, তাদের পশুপালনই একমাত্র জীবিকা —গরুই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। যে যেরকম জলবায়ু পেয়েছে সে সেই জলবায়ুতেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। কেবলমাত্র মানুষ নয়, পশুপাখীদের জীবনও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। শীতের দেশের প্রাণীর দেহ উষ্ণ রাখার জন্য বড় বড় লোম থাকে, গরম দেশে তার দরকার নেই বলে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে লোম ঝরে পড়ে। মাঞ্চুরিয়ার ঠাণ্ডার জন্য উস্যুরী বাঘের গায়ে বড় বড় লোম, কিন্তু ভারতীয় বাঘের গায়ে অতো বড়ো লোম নেই।

নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং সেই সঙ্গে এসব অঞ্চল উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়। খুব গরম এবং খুব বৃষ্টি হলে বাতাসের আর্দ্র'তা বাড়ে, ভ্যাপসা গরমে গাছপালার বাড়বাড়ন্ত হয়। নিরক্ষীয় নিচু এলাকায় বা উপত্যকা অংশে ঘন বনভূমি জন্ম নেয়। দীর্ঘদেহী বনস্পতির দ্বারা আচ্ছন্ন বনভূমিতে মাটি পর্যন্ত সূর্যের আলো এসে পৌছাতে পারে না। কঙ্গো, আমাজানের অববাহিকা, জাভা, সুমাত্রা, মালয়ের বনভূমি, আসামের

জঙ্গল—নিরক্ষীয় বনভূমির উদাহরণ। শাল, সেগুন, মেহগনি, শিশু, বিভিন্ন ধরনের বাঁশ, মশলা—যেমন লবঙ্গ গোলমরিচ, সুপারি, রবার, অর্কিড, নানান লতাপাতা—এসব হরেক রকমের গাছ নিরক্ষীয় এলাকায় জন্মায়।

নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর প্রভাবে আবহাওয়ামণ্ডলের উষ্ণতা যে কমে যায় তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে। এ সব অঞ্চলে পত্রমোচী বৃক্ষ বেশি দেখা যায়। শীতকালে যখন বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায় তখন যাতে গাছের জল পাতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে, তার জন্য শীতের দিকে গাছেরা পাতা ফেলে দেয়। শুধু তাই নয়, সরু লিকলিকে পাতা থাকার জন্য অন্য সময়ও পাতা মারফৎ জলের বাষ্পীভবন কম হয়। এল্‌ম্, ফিগ, ওক, পাইন, সিডার, স্প্রুস—এসব গাছই এসব দেশে বেশি দেখা যায়।

নিরক্ষীয় বনভূমি এবং তার নিকটস্থ মরুভূমির মাঝামাঝি অঞ্চলে কম বৃষ্টিপাত হওয়ার দরুন শুকনো ঘাসের মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটা বড় গাছ দেখা যায়। এসব অঞ্চলকে 'সাভানা' বলে। পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া-তাঙ্গানিয়ায় বনভূমি বলতে সাভানাই বোঝায়। সাভানা এলাকার বেশির ভাগই গরমকাল। কোন কোন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যে তৃণভূমি দেখা যায় তাদের স্থান বিশেষে নাম বদলায়। যেমন, রাশিয়ায় যা 'স্তেপ' তৃণভূমি, উত্তর আমেরিকায় তাই 'প্রেয়রী' তৃণাঞ্চল।

মেরু অঞ্চলের জলবায়ুর সিংহভাগই দখল করেছে শীত। বছরের দু'এক মাস যখন শীতের প্রকোপ কমে, কিছুটা বরফ গলে গিয়ে গুল্ম জাতীয় আগাছা জন্মায়। উত্তর কানাডা, সাইবেরিয়ায় একে 'তুন্দ্রা' বলে।

ভারতের জলবায়ু

ভারত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। ভারতের নানা স্থানে নানান ধরনের জলবায়ু দেখা যায়। একদিকে যেমন আসামের জঙ্গল, অন্যদিকে তেমনি রাজস্থানের মরুভূমি। দক্ষিণ ভারতে যেমন গ্রীষ্মের দাবদাহ প্রায় সারাবছর আমাদের সহ্য করতে হয়, তেমনি হিমালয়ের পথে পথে ছড়িয়ে আছে শৈত্যের প্রবাহ।

ভারতের আবহাওয়া তথা জলবায়ুকে বহির্ভারতীয় এলাকা সব সময়

নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, শীতকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে যে বৃষ্টিপাত তুষারপাত হয়, তার কারণ আফগানিস্তান থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত প্রসারিত একাধিক নিম্নচাপ। আবার বঙ্গোপসাগরে, ভারত মহাসাগরে নিম্নচাপের দরুন গ্রীষ্মের দিনগুলিতে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টিপাত হয়।

ভারতের জলবায়ুকে প্রধানত মৌসুমী বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে।' মৌসুমী বায়ু প্রায় সমুদ্রবায়ু-স্থলবায়ুর অনুরূপ। দিনের বেলা স্থল জলের থেকে তাড়াতাড়ি গরম হয় বলে স্থলে নিম্নচাপের উৎপত্তি হয়, এই নিম্নচাপ পূরণের জন্য সমুদ্র থেকে জলবাষ্পপূর্ণ বাতাস স্থলের দিকে ধেয়ে আসে—এর নাম সমুদ্রবায়ু। তেমনি, রাতের বেলায় স্থল জলের চেয়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়, স্থলে উচ্চচাপের উৎপত্তি হয়। তাই রাতে স্থল থেকে জলের দিকে বাতাস ধেয়ে যায়—এর নাম স্থলবায়ু। ঠিক এই এক কারণে একদিকে ভারত মহাসাগর, অন্যদিকে এশিয়া ভূখণ্ডের মধ্যে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ হয়। ডিসেম্বর, জানুয়ারী মাসে সূর্য যখন মকরক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন এশিয়ার মূল ভূখণ্ডে (প্রধানত মধ্য এশিয়া) উষ্ণতা বেশ নেমে যায়। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে এই সময় এশিয়ার ভূখণ্ডের উষ্ণতা সম অক্ষাংশ রেখায় অবস্থিত ভারত মহাসাগরের কোন অঞ্চলের উষ্ণতার চেয়ে ৮° থেকে ১৪° সেন্টিগ্রেড কম হয়। মধ্য এশিয়ায়, নিম্ন উষ্ণতার দরুন সেখানে উচ্চ বায়ুচাপ বিকশিত হয়। উচ্চ চাপের প্রভাবাধীন স্থলভাগ থেকে শুকনো হাওয়া মহাসাগরের দিকে ধেয়ে এলেও তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের আকাশে এসে পৌছাতে পারে না। উত্তুঙ্গ হিমালয় হিমশীতল বায়ুপ্রবাহকে আটকে দেয়। কিন্তু উচ্চচাপ যে শুধুমাত্র মধ্য এশিয়ায় বিকশিত হয়, তাই নয়, উত্তর ভারতের সমতলভূমিতেও উচ্চচাপ দেখা দেয়। উত্তর ভারতের উচ্চচাপ এলাকা থেকে যে হাওয়া ভারতীয় উপমহাদেশের উপর দিয়ে প্রভাবিত হয় তা শুকনো ও শীতল। এরই নাম 'উত্তুরে হাওয়া'। শীতকালে আমরা সবাই এ হাওয়ার সঙ্গে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত শীতকালীন এই বায়ুপ্রবাহর নাম—শীতকালীন মৌসুমী বায়ু। শীতকালে সমস্ত ভারতে উজ্জল দিন, পরিষ্কার নীল আকাশ, কনকনে ঠাণ্ডা, অনার্দ্র উত্তুরে হাওয়া প্রবাহিত হয়। উত্তর ভারত থেকে এই শৈত্যপ্রবাহ এমন তীব্রতার সঙ্গে নামতে থাকে যে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা প্রায় ৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে যায়।

ভারত
গড় বায়ুচাপ ও
বায়ু প্রবাহ
গড় বায়ু প্রবাহ
গড় চাপ (মিলিবার)
জানুয়ারী
জুলাই
নিম্নচাপ
উচ্চচাপ
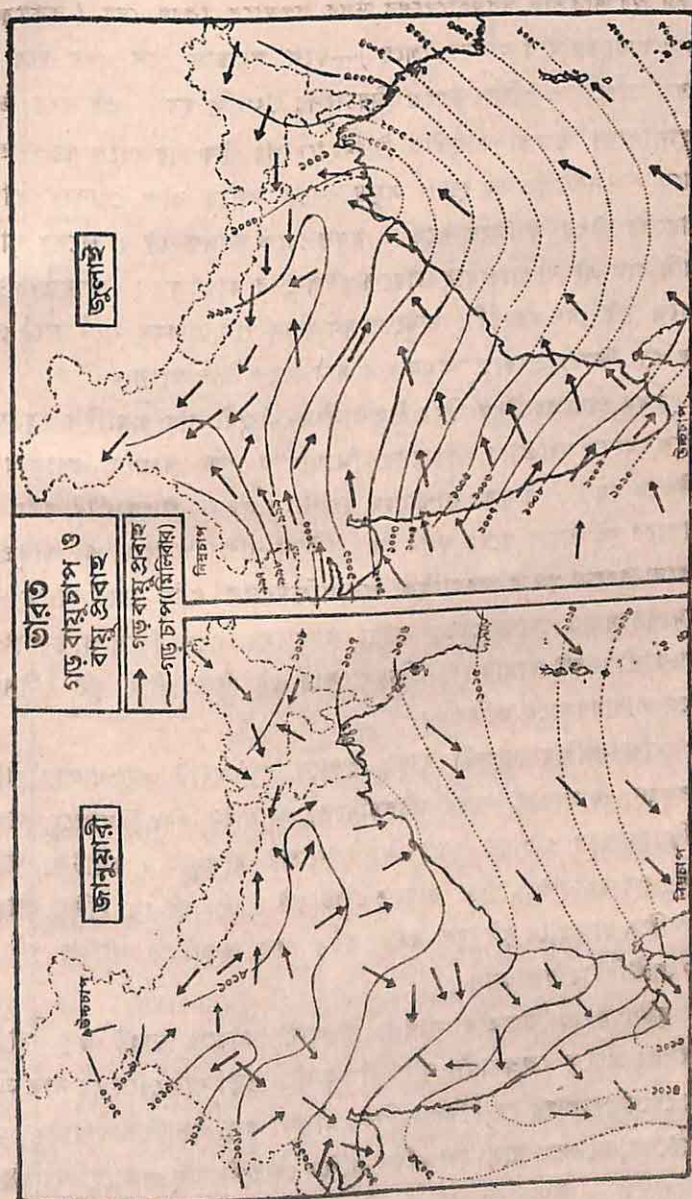
গ্রীষ্মকালে ঠিক বিপরীত কারণে বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়। জুন-জুলাই মাসে সূর্য ভারতীয় উপমহাদেশের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় (কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতের মাঝ বরাবর গেছে)—ফলে স্থলভাগ বেশ গরম হয়ে ওঠে এবং ভারতে ও এশিয়া ভূখণ্ডে নিম্নচাপের উৎপত্তি হয়। এই সময় ভারত মহাসাগরের উষ্ণতা ভারতীয় উপমহাদেশের উষ্ণতার থেকে গড়পড়তা ৫° থেকে ৮° সেন্টিগ্রেড কম হয়। সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প বোঝাই বাতাস ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমুদ্র থেকে আগত এই বাতাসের আর্দ্রতা বেশি বলে এই বাত্যাপ্রবাহ ভারতে বৃষ্টিপাতের কারণ হয়। আমাদের কৃষি-কাজে বৃষ্টি বেশ দরকারী, ভারতের মূল ফসল ধান এ সময় মাঠে মাঠে রোয়া হয় এবং শীতের প্রারম্ভে আমন ধান মাঠ থেকে উঠে আসে।

যখন ভারতের উপর দিয়ে শীতকালীন মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন মাঝে মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য, ইরাণের নিম্নচাপের দরুন পাঞ্জাব এলাকায় খুব বৃষ্টিপাত হয়। এ সময় কাশ্মীরেও বরফপাত হয়। শীতকালীন বৃষ্টির জন্য পাঞ্জাবে খুব ভালো গমের ফলন হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই বায়ুপ্রবাহ কখনো কখনো গঙ্গার অববাহিকা ধরে পশ্চিমবাংলা পর্যন্ত ধেয়ে আসে এবং বঙ্গোপসাগরের থেকে ভেসে আসা বাতাসের সঙ্গে মিলে পশ্চিমবাংলায় শীতকালীয় বৃষ্টি নামায়। পশ্চিমবাংলার এই শীতকালীন বৃষ্টি রবিশস্যের পক্ষে সাধারণভাবে ক্ষতিকর।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিম উপকূলে, মালাবার, কঙ্কন তীরভূমিতে, আসামে, নিম্ন হিমালয়ে, বাংলা, উড়িষ্যায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (কর্ণাটক, পশ্চিম অন্ধ্র, পূর্ব মহারাষ্ট্র), উত্তর ভারতে মোটামুটি ভালো বৃষ্টি হয়, দক্ষিণ পাঞ্জাব ও পশ্চিম রাজস্থানে বৃষ্টি খুব কমই হয়। থর মরুভূমিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৩ সেন্টিমিটারেরও কম।

বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুযায়ী ভারতে চারটি ঋতু আছে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস শীতকালীন ঋতু, মার্চ থেকে মে মাস গ্রীষ্ম, জুন থেকে সেপ্টেম্বর হল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত বর্ষাকাল এবং অক্টোবর, নভেম্বর মাস হল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রত্যাহারের ঋতু বা হেমন্তকাল। শীতকালে পূর্ব বা দক্ষিণ ভারতের তুলনায় উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেশি ঠাণ্ডা থাকে। নিম্নচাপের প্রভাবে যেমন পাঞ্জাবে

ভারত
দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ
আগমন ও প্রত্যাহারের সময়সীমা
আগমন
প্রত্যাহার
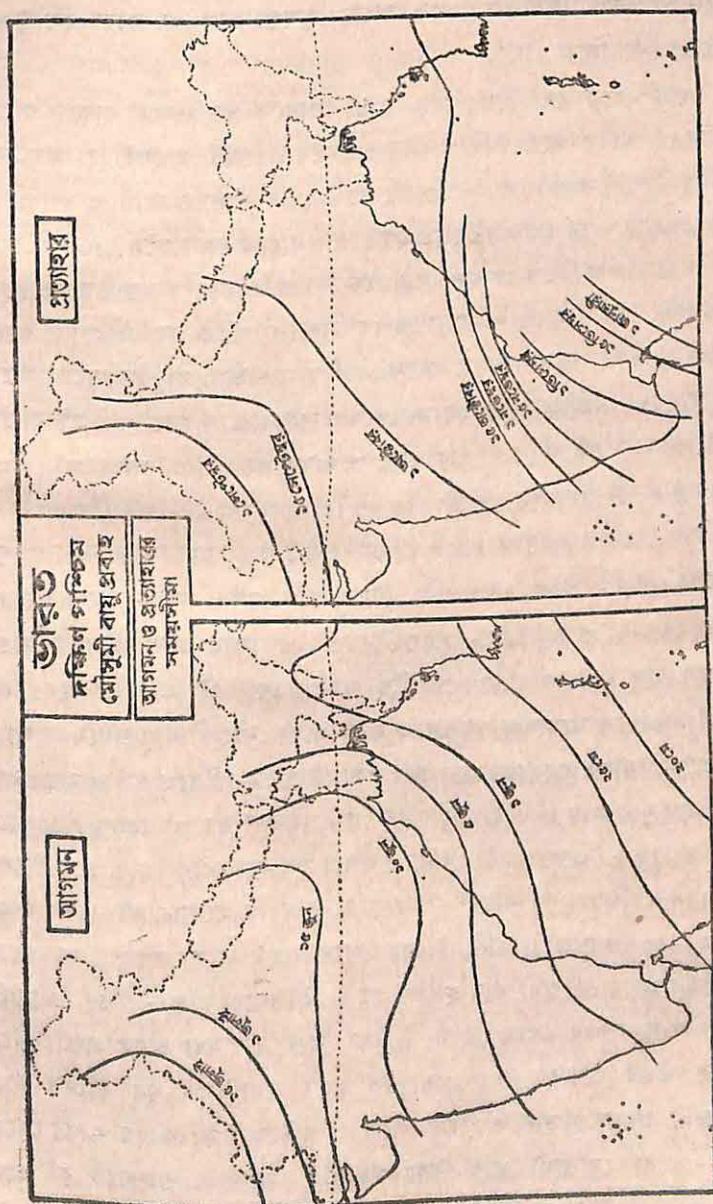
বৃষ্টি হয় তেমনি হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীর উপত্যকা ও হিমালয়ে এ সময় বরফ পড়ে। বস্তুত হিমালয়ে বরফ জমার প্রশস্ত কাল ও কারণ হল শীত ও শীতের নিম্নচাপ।

মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সারা ভারতে গড় উষ্ণতা বাড়তে থাকে। দক্ষিণের মহাসাগরে ওদিকে উষ্ণতা কমে। মার্চ মাসেই দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে উষ্ণতা প্রায় ৩৮° সেন্টিগ্রেড হয়, এপ্রিলে গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে উষ্ণতা উঠে প্রায় ৪৩° সেন্টিগ্রেড হয়। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে থার্মোমিটারের পারদ ৪৮° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠে পড়ে। প্রচণ্ড গরমের জন্য উত্তর ভারতের সমতলে, মহারাষ্ট্রে, পশ্চিমবাংলায় যে নিম্নচাপ গঠিত হয় তা পূরণ করতে সন্ধ্যার দিকে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পভরা বাতাস ছুটে আসে, বোম্বাইয়ের নিকটস্থ সমুদ্র এলাকা থেকেও এই বাতাস আসে। এই বাতাস বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি ঘটায়। এর নাম কালবৈশাখী (Nor'-westers)। এই সময় দু'একটা টরনেডোরও উৎপত্তি হয়।

জুন থেকে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের কাল। জুন মাসের গোড়ার দিকে মালাবার তীরভূমিতে প্রথম মৌসুমী বায়ু আঘাত করে, কেরালা ও কর্ণাটকের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে যায়। আরব সাগরের উপর উচ্চচাপ জলীয় বাতাসভরা এই বাত্যাপ্রবাহের জন্য দায়ী। ওদিকে বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা মৌসুমী বায়ু প্রথমে আসাম-চট্টগ্রাম-বার্মাতে আঘাত করে এবং এই সব স্থানে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে বায়ুপ্রবাহ পূর্বদিকে ঘুরে যায়। পূর্বদিকে পূর্ববাংলা, হিমালয়ের পাদদেশে, উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি নামায়। এজন্য ভরা বর্ষায় আমরা পূর্বদিক থেকে মেঘ ও বাতাসের আগমন দেখি। আসামের চেরাপুঞ্জি পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের স্থান, বাৎসরিক এক হাজার সেন্টিমিটারের উপরে। জুন মাসের দশ তারিখ নাগাদ পশ্চিমবাংলায় মৌসুমী বায়ু হাজির হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে উড়িষ্যা, অন্ধ্র হয়ে মধ্য ভারত এবং সেখান থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মোটামুটি জুন মাসের মধ্যে মৌসুমী বায়ু সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ওদিকে উত্তর আরব সাগর থেকে উঠে আসা মৌসুমী বায়ু উত্তর মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, গুজরাটে বৃষ্টি এনে মধ্য ভারতের দিকে এগিয়ে গেলে আরব সাগরের ও বঙ্গোপসাগরের মৌসুমী বায়ুদ্বয়ের মিলন হয়। সারাভারতে তুমুল বর্ষা আসে।

সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে ধীরে ধীরে মৌসুমী প্রত্যাহৃত হতে শুরু করে। প্রথমে উত্তর ভারতে, তারপর পূর্ব ভারতে, তারও পর দক্ষিণ ভারত থেকে বর্ষার বাতাস সরে যায়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অর্থাৎ হেমন্তকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রত্যাহারের পথে তামিলনাড়ুতে বৃষ্টি নিয়ে আসে। ফিরে আসা মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প টেনে আনে এবং বৃষ্টি হয়ে মাদ্রাজ প্রদেশে ঝরে পড়ে। এই বৃষ্টিকে অনেকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বলেন। তাই তামিলনাড়ুতে বছরে দু'বার বৃষ্টি হয়—জুলাই-আগস্ট মাসে একবার এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আর একবার। তবে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বাধার জন্য জুলাই-আগস্ট মাসের বৃষ্টি তেমন জোরালো হয় না। হেমন্তকালে প্রায়ই বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ গঠিত হয় তা পশ্চিমদিকে ঘুরে করমণ্ডল উপকূলে ঝড় বৃষ্টি নামায়। একটা কথা আমাদের জানা উচিত, আরব সাগরের মৌসুমী বায়ু কেরালার পালঘাট গ্যাপের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে দক্ষিণ নীলগিরির পাহাড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভূত ঘুর্ণিঝড় অন্ধ্র, উড়িষ্যা, বাংলার উপকূলে ঝড়বৃষ্টির কারণ হয়।

মোটকথা, সারাভারতের জলবায়ু প্রধানত মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং একটি নিখুঁত ছন্দে প্রতি বছর ভারতে ঋতুগুলি ফিরে ফিরে আসে। এই সব কারণে ভারতের প্রায় সর্বত্র মানুষের বাস আছে, প্রায় সর্বত্র চাষবাসের কাজ হয়—কৃষিকাজে পৃথিবীর প্রথম সারির দেশগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ

দৈনন্দিন জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব অপরিসীম বলে প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ আগাম আবহাওয়ার খবর জানার চেষ্টা করেছে। আদিম মানুষের কাছে মেঘ মানেই বৃষ্টি, সূর্য মানেই গরম—এমন ধারণা স্বাভাবিক ছিল এবং এরকমের মোটামুটি একটা জ্ঞান নিয়ে আমাদের দীর্ঘকাল চলতে হয়েছিল। তারপর, একদিন ইউরোপের রেনেসাঁসের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়ে আর সব বিজ্ঞানের সাথে সাথে আবহাওয়া বিজ্ঞান জন্মলাভ করে। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাষের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই—এমন অভিযোগ হামেশা শোনা যায়। অভিযোগগুলি শুধু যে আমরাই করি তা নয়, সব দেশের জনসাধারণেরই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। এজন্য হাওয়া অফিস-গুলি দায়ী নয়, আবহাওয়ার জটিলতার সঙ্গে মানানসই বিধিব্যবস্থা এখনো দেশে দেশে গড়ে ওঠেনি—তাই পূর্বাভাষ ও ঘটনায় এতো পার্থক্য দেখা যায়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেবার ইতিহাস পুরানো—কত পুরানো তা জানা যায় না। প্রাচীন ভারতে খনার বচনগুলি ছিল এমনই সব আবহাওয়ার পূর্বাভাষ। চাষবাসের জন্য এককালে খনার বচনের উপর জনসাধারণ খুব নির্ভর করতো। যেমন,

কি কর শ্বশুর লেখা জোখা। মেঘেই থাকে জলের রেখা॥
কোদাল কুড়্‌লে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে ঘা॥
বলো চাষার বাঁধতে আল। আজ না হয় হবে কাল॥

অর্থাৎ, লেখাজোখার দরকার নেই, মেঘ দেখলেই বোঝা যায় কি রকম বর্ষা হবে। কোদালে কোদালে মেঘ, মধ্যে মধ্যে বাজের আওয়াজ শুনলে বুঝতে হবে দু'এক দিনের মধ্যে তুমুল বর্ষা আসছে। অথবা,

চৈত্র কাঁপে থর থর। বৈশাখেতে ঝড় পাথর।
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে। তবেই জানবে বর্ষা বটে।

অর্থাৎ, যে বছর চৈত্র মাসে শীত থাকে, বৈশাখে শিলাবৃষ্টি হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ পরিষ্কার থাকে—সে বছর প্রবল বর্ষণ হয়।

শুধু আমাদের দেশে কেন, অন্য দেশেও এরকম আবহাওয়া নিয়ে ছড়া প্রচলিত আছে। যেমন, Rain before seven, fine before eleven— অর্থাৎ, নিম্নচাপের জন্য বা অগ্রসরমান শীতল সীমানার জন্য বৃষ্টিপাত চার পাঁচ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয় না। এরকম নানা ছড়ার মধ্য দিয়ে সেকালের পর্যবেক্ষকরা আবহাওয়ার আগাম বার্তা জানাতেন। ছড়াগুলি কিছু কিছু মিললেও, বেশির ভাগই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না।

গ্রীসে এককালে আবহাওয়া নিয়ে নানান গবেষণা হত। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়ার উপর প্রথম বই লেখেন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল। Meteoroligca নামের এই বইটিতে আবহাওয়া সম্পর্কে নানান খুঁটিনাটি তথ্য লেখা আছে। অ্যারিস্টটল আট রকম বাতাসের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যন্ত্রপাতির অভাবে আবহাওয়ার উপর গবেষণা আর অগ্রসর হয়নি। তবে শ' পাঁচেক বছর আগেও গীর্জার চূড়ায় বায়ুমোরগ ঘুরতে দেখা যেত— এমন তথ্য সেকালের লেখাপত্রে পাওয়া যায়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে রেনেসাঁর সুসন্তান লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এর প্রায় একশ' বছর পরে গ্যালিলিও গ্যালিলি আদি থার্মোমিটার বানাতে সক্ষম হন। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইভান-গেলিস্তা টরেসেলি বাতাসের চাপ মাপার যন্ত্র (ব্যারোমিটার) আবিষ্কার করেন এবং সেই থেকে আবহাওয়া-বিজ্ঞানের উপর প্রথাসম্মত গবেষণা শুরু হয়। আবহাওয়ার উপর নানা বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানে বহু তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। অক্সফোর্ডের জনৈক ভদ্রলোক ১৩৩৭ থেকে ১৩৪৪ সাল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় থেকে ব্রিটিশ নৌবাহিনী বাতাসের গতিবেগ লিপিবদ্ধ করে। ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই ১৬৮৪ সালে বৃষ্টি মাপার যন্ত্র এবং তার দু' বছর পর ইংরাজ বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালি (যাঁর নামে হ্যালির ধূমকেতু নামকরণ হয়েছিল) মৌসুমী বায়ু, বাণিজ্য বাতাসের কারণ ব্যাখ্যা করেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও ল্যাভোসিয়ে এবং ১৮৫৪ সালে ফরাসী জ্যোতির্বিদ ল্যেভেরিয়ে আবহাওয়া দপ্তর স্থাপন করেন। ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কার এবং বহু সংখ্যক আবহাওয়া স্টেশনের স্থাপনা আবহাওয়া গবেষণাকে এগিয়ে দেয় এবং নিয়মমাফিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া শুরু হয়।

বিশ্বজনীন চরিত্র

আজ পৃথিবীর সব দেশে একটি করে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর ও একাধিক আঞ্চলিক দপ্তর আছে। আমাদের দেশে পুণেতে আবহাওয়ার কেন্দ্রীয় দপ্তর অবস্থিত, এছাড়া প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে আঞ্চলিক দপ্তর এবং দেশের নানা স্থানে ছড়ানো ছোট ছোট বহু আবহাওয়া কেন্দ্র আছে। সরকারী আবহাওয়া বিভাগ ব্যতীত বিমান বাহিনী, অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা, কৃষি বিভাগ, বন বিভাগ, গবেষণা কেন্দ্রগুলি আবহাওয়ার উপর সবসময় তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। সরকারী দপ্তর থেকে গণমাধ্যম মারফৎ আবহাওয়ার সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক স্বীকৃত World Meteorological Organisation (WMO) আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার খোঁজখবর নেয়। আজ সারা দুনিয়ায় অন্তত দশ হাজার আবহাওয়া দপ্তর কাজ করছে। আবহাওয়া কোন রাজনৈতিক ভেদাভেদ বা মতপার্থক্য মানে না, তাই সঠিক আবহাওয়ার খবর জানতে হলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। দেশের মধ্যে যত বেশি আবহাওয়া দপ্তর থাকবে এবং যত তাড়াতাড়ি দপ্তর থেকে তথ্যগুলি কেন্দ্রীয় হাওয়া অফিসে পৌছে দেওয়া যাবে তত ভালোভাবে ও নিখুঁতভাবে আবহাওয়ার উপর ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব হবে। বাতাসের চাপ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বাতাসের গতিবেগ, মেঘের অবস্থান ইত্যাদি জানার জন্য আমাদের সর্বত্র আবহাওয়া দপ্তর বসাতে হয়। কোথাও এই দপ্তর শহরে, কোথাও নির্জন বনভূমিতে, কোথাও সমুদ্র উপকূলে, কোথাও বা সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে দেখা যায়। এমনকি বিমান, বেলুনের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশে আবহাওয়া কেমন চলছে তা জেনে নেওয়া হয়। আধুনিক আবহাওয়া গবেষণায় রাডার, কৃত্রিম উপগ্রহ, কম্প্যুটার বা যন্ত্রগণকের প্রয়োজন খুব বেশি। রাডার যন্ত্র মেঘের অবস্থান, আগত ঘূর্ণিঝড়ের দূরত্ব মেপে আমাদের অগ্রিম সাবধানবাণী দেয়। দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি আসছে কিনা তা বোঝার জন্যও আমরা রাডার ব্যবহার করি। বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে বৃষ্টি নামলে রাডার সঠিকভাবে তার খবর জানিয়ে দিতে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেবার কাজে আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার

করা হচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহতে টেলিভিসন ক্যামেরা (দৃশ্য ও অবলোহিত) বসিয়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মেঘের ছবি তোলা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা মাটির উপর দাঁড়িয়ে মাথার উপরের মেঘের দৃশ্য দেখতাম, কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ এখন থেকে আমরা মহাকাশ থেকে দেখা মেঘের ছবি পাচ্ছি। কোন অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় গড়ে উঠছে কিনা বা গড়ে উঠলে তার অবস্থান, গতিবেগ, ধ্বংসলীলার ক্ষমতা ইত্যাদি তথ্য উপগ্রহ আমাদের জানায়। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে যে শত শত মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, তার অগ্রিম খবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সময় মতোই দিয়েছিল। পৃথিবীর যে যে অংশে সাধারণত নিম্নচাপের জন্য ঘূর্ণিঝড় জন্ম নেয়, যেমন বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ চীন সাগর, ক্যারাবিয়ান সমুদ্র—সে সব অঞ্চলের উপর কৃত্রিম উপগ্রহর ক্যামেরা সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখে। আবহাওয়া দপ্তরগুলি আজকাল ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ চার পাঁচ শ' মাইল দূর থেকে পেয়ে যায়, সময়-মতো বিধিব্যবস্থা নিতে পারে। পাহাড় চূড়ায় কতটা মেঘ জমেছে, কতটা তুষার পড়ছে, নদী উপত্যকায় হঠাৎ বন্যা এলো কিনা—এসব দেখার ভারও নিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহর ক্যামেরা।

হাওয়া অফিসে একদিন

দেশের নানা স্থানে ছড়ানো আবহাওয়া কেন্দ্রগুলি সব সময় কাজ করে চলেছে, বায়ুচাপ, উষ্ণতা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, মেঘের চরিত্র, শিশিরাংক, বৃষ্টির পরিমাণ—সব তথ্য নিখুঁতভাবে মাপছে, লিপিবদ্ধ করছে। এসব তথ্যগুলি দ্রুত কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠানো হয়। আগে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের সাহায্যে এসব কাজ করা হত, আজকাল টেলিপ্রিণ্টার ব্যবহৃত হচ্ছে। আবহাওয়াবিদরা সাধারণ ভাষায় তথ্য পাঠান না—তা পাঠালে দিস্তা দিস্তা কাগজ খরচ হত। সাধারণ ভাষার পরিবর্তে তাঁরা কোড ভাষা ব্যবহার করেন। আবহাওয়া সম্পর্কিত সব তথ্য কোডে প্রকাশ করা যায়। এই কোডগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্বীকার করে, তাই পৃথিবীর যে কোন আবহাওয়াবিদ অন্য আবহাওয়াবিদের পাঠানো তথ্য কোডের মারফৎ বুঝতে পারবে।

একটি কোডে কি কি বলা হয়? আকাশ কতটা মেঘাচ্ছন্ন, মেঘের

ধরনটা কেমন, বাতাসের চাপ, গতিবেগ, আদ্র´তা, উষ্ণতা, শিশিরাংক, বৃষ্টি, ঝড়, কুয়াশা, তুষারপাত—সব কোডে জানানো হয়। ধরা যাক কোন আবহাওয়া কেন্দ্র কোন বিশেষ দিনে যা যা পর্যবেক্ষণ করলো তা
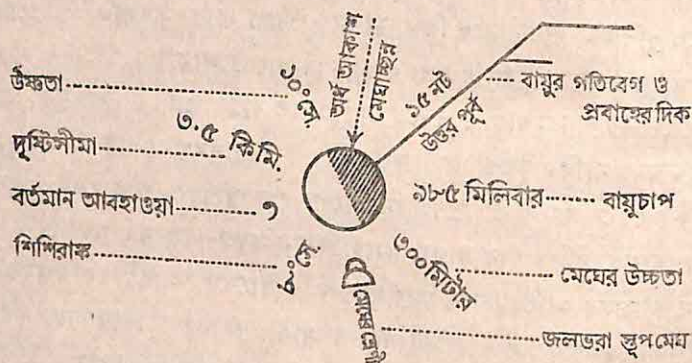
আবহাওয়া-কোড

এইরকম : বাতাসের উষ্ণতা ১৬° সেন্টিগ্রেড, ৪.৮ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়, ঐ সময় ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আবহাওয়ামণ্ডলের শিশিরাংকর মান ১৪° সেন্টিগ্রেড, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রতিঘণ্টায় প্রায় দশ নটিকাল মাইল গতিবেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, নিচে স্তর-মেঘ এবং উপরে কেশ-মেঘ, আকাশের আটভাগের পাঁচভাগ মেঘে আচ্ছন্ন, বায়ুচাপের মান ১০১৩.২ মিলিবার। এই সব তথ্য একসঙ্গে কোড ভাষায় এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

সব তথ্য পেয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে বসে আবহাওয়াবিদ একটি কাগজের উপর (যেখানে দেশের ভৌগোলিক ম্যাপ আঁকা আছে) সমচাপ রেখাগুলি আঁকেন। প্রধান প্রধান শহরগুলিতে আকাশ কতটা মেঘাচ্ছন্ন তা কোডের মারফৎ মানচিত্রে দেখান, পাশে ঐ স্থানে বায়ুর গতিবেগ ও দিক চিহ্নিত করেন। নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের স্থানগুলি আলাদাভাবে দেখিয়ে দেন। এরপর বাতাসের উষ্ণতা ও গতিবেগের সাহায্য দিয়ে উষ্ণ বা শীতল বায়ুর সীমানাগুলি আঁকেন। এই চার্টকে আমরা Synoptic চার্ট বলি।

এর পর Synoptic চার্ট ও যন্ত্রগণকের সাহায্যে আবহাওয়াবিদ আবহাওয়ার ভবিষ্যৎ বোঝার চেষ্টা করেন। পরবর্তী চব্বিশ বা আটচল্লিশ

ঘণ্টার মধ্যে বাতাসের আর্দ্রতা, ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাতাসের উষ্ণতা, চাপ বাড়বে না কমবে ইত্যাদি খবর বলার চেষ্টা হয়। আবহাওয়া নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী যেমন ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে করা হয়, তেমনি আবার স্থানীয় অঞ্চল সম্পর্কে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া চলে। আমরা পুণে থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় সারা ভারতে কি আবহাওয়া হতে চলেছে তা জানতে পারি, কলকাতার আলিপুরের হাওয়া অফিস পূর্বভারতের উপর, বিশেষ করে গাঙ্গেয় পশ্চিম বাংলার উপর আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেয়। ইলেকট্রনিক শিল্পের অগ্রগতির জন্য এবং যন্ত্রগণকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আজকাল আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী সহজে করা যায়। রেডিও ট্রানস্‌মিসনের মাধ্যমে আজকাল পৃথিবীর এক অঞ্চলের আবহাওয়া-লেখচিত্র অন্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া (Facsimile weather charts) হয়। এইভাবে জাপান, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে আবহাওয়া-লেখ আদানপ্রদান হয়। এই লেখকে যন্ত্রগণকের সামনে ধরা হয়। অগ্রিম প্রোগ্রামিং-এর ভিত্তিতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঐ আবহাওয়ায় কি কি পরিবর্তন হতে পারে তা যন্ত্রগণক বলে দেয়। বস্তুতপক্ষে আবহাওয়ার বিষয়টি একটি জটিল গাণিতিক সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই যন্ত্রগণক যে সংবাদ জানায় তার সঙ্গে বাস্তবের গরমিল তেমন থাকে না।

এরপর আছে রাডার, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি। রাডার কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় মেঘ হয়েছে, কোথায় বজ্রপাত হচ্ছে তা নিখুঁতভাবে বলে দেবে। কৃত্রিম উপগ্রহ জানাবে কোথায় নিম্নচাপ হচ্ছে, কোথায় কোন্ প্রকার মেঘ জমছে—এই সব। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। শুধু এই নয়, সারা বিশ্বের আবহাওয়া-লেখ থেকে এক মাসের অগ্রিম আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব।

গবেষণা ও যন্ত্রপাতির উন্নতি সত্ত্বেও আবহাওয়ার উপর সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সব সময় সম্ভব হয় না। এর কারণ, দ্রুত আবহাওয়ার তথ্য পাওয়া যায় না, তথ্যের মধ্যে ভুলভ্রান্তি থাকে। শক্তিশালী যন্ত্রগণক থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার উপর ভবিষ্যৎবাণীর যথার্থতা নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, ঠিকঠাক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ পেতে হলে আবহাওয়ার ইতিহাস জানা দরকার। কিন্তু একশ' বা সওয়াশ' বছর পর্যন্ত আবহাওয়ার তথ্য আমাদের হাতে আছে, তার আগের ব্যাপার

জানা নেই। তবে যত দিন যাচ্ছে আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাষে নিখুঁত হয়ে উঠছি।

প্রত্যেক দেশেই প্রতি ছয় ঘণ্টা বা বারো ঘণ্টা পর পর আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানানো হয়। সাধারণভাবে সকাল ছ'টা, দুপুর বারোটা, সন্ধ্যে ছ'টা এবং রাত বারোটায় আবহাওয়ার পূর্বাভাষ ঘোষিত হয়, তাছাড়া সময়ে সময়ে স্থানীয় আবহাওয়ার কথা জানানো হয়।

আমরা প্রায়ই দেখি, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ ঠিক মতো মেলে না। এর জন্য যন্ত্রপাতি বা বিজ্ঞানী যতটা দায়ী তার থেকে ঢের বেশি দায়ী আবহাওয়া স্বয়ং। যেমন, বৃষ্টি সাধারণভাবে একটানা আধঘণ্টার বেশি হয় না। আধঘণ্টার পর বৃষ্টি থামলে আবার ঠিক কতক্ষণ পর বৃষ্টি আসবে তা আগাম বলা যায় না, তাই আবহাওয়াবিদকে পূর্বাভাষে 'মাঝে মাঝে বৃষ্টি'—এরকম একটা ভাসা-ভাসা কথা ঘোষণা করতে হয়। আবার ঘূর্ণি-ঝড়ের জন্য যে বৃষ্টি তা চার-পাঁচ দিন চলে। এ ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘণ্টা বা আটচল্লিশ ঘণ্টা পরের বৃষ্টিপাতের অগ্রিম খবর জানিয়ে দেওয়ার অসুবিধা নেই। টরনেডো, বজ্রপাতের সম্ভাব্য স্থান ঘোষণা করাও আবহাওয়াবিদের পক্ষে সম্ভব নয়, এই ব্যাপারগুলি এখনো আমরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ আমাদের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। সময়মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার আভাস পেলে আমরা মানবজীবন ও লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি রক্ষা করতে পারি। সেজন্য গণপ্রচার মাধ্যম-গুলি, যেমন খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিসনে নিয়মিত ও সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাষ প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। আবহাওয়ার খবরাখবর তাঁদেরই বেশি দরকার হয়, যাঁরা বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রে কাজ করেন। বিমান, জাহাজ চলাচলে আবহাওয়ার সংবাদ চাই। আবহাওয়া ঠিক না থাকলে বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখি যে অত্যধিক কুয়াশা ও ঝড়বৃষ্টির জন্য বিমান বন্দর থেকে বিমান ওঠানামা করতে পারেনি। খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সমুদ্রে যারা জাহাজ চালায়, যারা মাছ ধরতে যায়, আবহাওয়ার উপর তাদের নজর রাখতে হয়। কৃষি কাজে, সমুদ্র উপকূলের জনজীবনে,

পরিবহণ ব্যবস্থায়, কতগুলি বিশেষ ধরনের ব্যবসায় অগ্রিম আবহাওয়া-সংবাদ জানা একান্ত প্রয়োজন।

আলিপুর হাওয়া অফিস থেকে কোন এক দিনে প্রচারিত আবহাওয়ার পূর্বাভাষ ছিল এই রকম:

আগামী চব্বিশ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাষে জানানো হচ্ছে যে বজ্র-বিদ্যুৎসহ মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হতে পারে, দিন ও রাতের উষ্ণতা বাড়ার
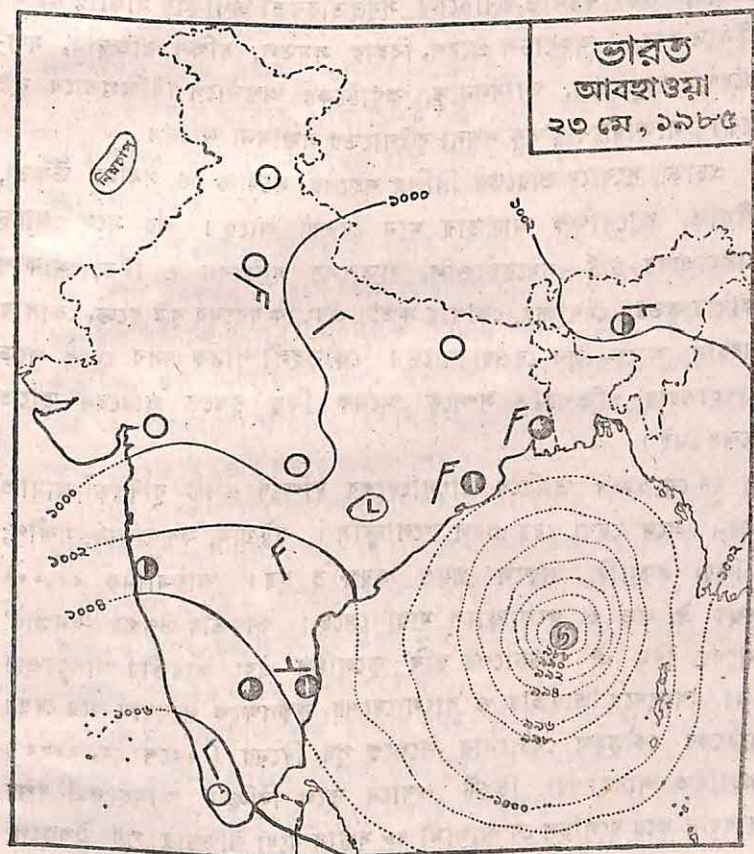
সম্ভাবনা আছে। গত দিনে সর্বোচ্চ উষ্ণতা ছিল ২৯.৭° সেন্টিগ্রেড, যা স্বাভাবিকের থেকে ২° কম এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা ছিল ২৪.৬° সেন্টিগ্রেড—এই উষ্ণতা স্বাভাবিক। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল যথাক্রমে

৯৬% ও ৮৩%। গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৬.৩ মিলিমিটার।

ঐ দিন পুনা থেকে প্রচারিত সর্বভারতীয় আবহাওয়ার খবরে বলা হয়: গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা, সিকিম, উড়িষ্যা, বিহার মালভূমি, গুজরাট, উত্তর কঙ্কন ও কর্ণাটকের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হবে। অরুণাচল প্রদেশ, বিহার সমতল, দক্ষিণ রাজস্থান, মধ্য-প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকের অন্তর্ভাগে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে। লাক্ষাদ্বীপে দু'এক পশলা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।

এছাড়া, সংবাদে ভারতের বিভিন্ন শহরের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান দেওয়া আছে। এর সঙ্গে আছে আবহাওয়ার চার্ট—সমরেখাগুলি, বাতাসের গতিবেগ ও দিক, আকাশ কোথায় কতটা মেঘাচ্ছন্ন, কোথায় কতটা এবং কি ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে, কোথায় নিম্নচাপ আছে—সব দেওয়া আছে। কৌতূহলী পাঠক এসব দেখে পড়ে আবহাওয়ায় গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝতে পারবেন তাতে সন্দেহ নেই।

২৪ মে ১৯৮৫ তারিখে বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করে। সঙ্গে দেখা দেয় প্রবল জলোচ্ছাস। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সন্দীপ, হাতিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়। আনুমানিক ৫০,০০০ মানুষ ঐ ঝড় ও জলোচ্ছাসে মারা গেছে। ভারতীয় উপগ্রহ 'ইনস্যাট' আগের দিন ঐ নিম্নচাপের ছবি তুলেছিল এবং ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর যথাসময়ে ভারতীয় ও বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দেয়। পাঠকের কৌতূহল মেটানোর উদ্দেশ্যে পূর্ব দিনের (২৩শে মে, ১৯৮৫) প্রচারিত আবহাওয়া চিত্রটি এখানে তুলে দিচ্ছি। আবহাওয়া দপ্তর সাবধান করে বলেছিল যে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উড়িষ্যার পূর্ব উপকূলে, গাঙ্গেয় পশ্চিম বাংলায়, বাংলাদেশের দক্ষিণে ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে; এর প্রভাবে ভীষণভাবে বৃষ্টিপাত হবে। কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে ব্যবস্থা নিতে পারলে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি কমতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আবহাওয়া ও আমরা

পৃথিবীর বহিরাবরণ, মাটি পাথর জল বাতাস, অর্থাৎ আমাদের পরিবেশ মানবজীবনের বিকাশ ও বিবর্তনে নিরন্তর সাহায্য করে চলেছে। এই যে চারপাশের জড় জগৎ, তার মধ্যে প্রতিনিয়ত শক্তি ও বস্তুর আদান-প্রদান হচ্ছে। উত্তাপ প্রবাহিত হচ্ছে একদিক থেকে অন্যদিকে, কঠিন রূপান্তরিত হচ্ছে তরলে, তারপর গ্যাসে। মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে জলে ধুয়ে সমুদ্রে আসছে, গড়ে উঠছে নতুন দ্বীপ, জল ভূছিদ্র পথে পাতালে নেমে যাচ্ছে, সূর্যতাপে সমুদ্রজল বাষ্পায়িত হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে, উত্তুঙ্গ পর্বতে বরফস্তূপ জমে থাকছে।

ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল এসব চলছে। এর মধ্যেই উদ্ভিদ প্রাণীর জন্ম মৃত্যু বিবর্তন। কবে কোন্ অতীতকালে, পুরাকালীন বিজারক আবহাওয়ায় কর্দমাক্ত জলে (Primitive Soup) আদি রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি ঘটেছিল, জন্ম নিয়েছিল জটিল, জটিলতর অণু, শেষে ডি. এন. এ.। ডি. এন. এ. গঠনের পর জীবনের বিকাশ হল, প্রস্ফুটিত হল প্রাণ। জটিল অণু তার প্রতিচ্ছবি তৈরি করার ক্ষমতা পেল।

সেই থেকে পরিবেশের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ, আদানপ্রদান চলছে। জীবন বিকাশের অগ্রসর স্তরে যে পরিবেশ ছিল, তার পর থেকে পরিবেশের তেমন বদল হয়নি। বাতাসের মোট নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড পরিমাণে ঠিকই রয়ে গেছে। একদিকে যেমন তাদের ক্ষয় হয়েছে, অন্যদিক থেকে পূরণও হয়েছে।

এই সব কারণে হাজার হাজার বছর পৃথিবীর আবহাওয়া একরকম রয়ে গেছে। স্থানীয় কারণে মাঝে মধ্যে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি হলেও সাধারণভাবে যেখানে যতটা বৃষ্টি হওয়ার কথা—ততটাই হয়েছে। যা যা পরিবর্তন হয়েছে তাতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। কোথাও মরুভূমি এগিয়েছে, কোথাও বনভূমি। কোথাও নদী পথ বদল করেছে, কোথাও দ্বীপ উঠেছে। আবার শীতে বরফপাত, গরমে গরম পড়েছে, ঠিকঠাক বায়ু প্রবাহিত হয়েছে। পৃথিবীর গড়-আবহাওয়া প্রায় সুনির্দিষ্ট।

কিন্তু এতদিনে বুঝি সত্যি বিপদ ঘনিয়ে এলো, পরিবেশ দূষণ আজকের বড় সমস্যা। পরিবেশের উপর মানুষের হাত পড়েছে। এই শতাব্দীর গোড়া থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক শিল্পায়ন, মানুষের কর্মকাণ্ড, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরপর দু'টি মহাযুদ্ধ এবং আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতি পরিবেশকে অশান্ত করে তুলেছে। বাতাসের গড় উষ্ণতা বাড়ছে, বাড়ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, ধুলোবালি। শহরে গরম বেড়েছে, ফলে বেড়েছে বৃষ্টিপাত। মহানগরের উঁচু অট্টালিকাগুলি হাওয়ার স্বাভাবিক গতি বদলে দিচ্ছে।

কলকারখানা, ডিজেল ও পেট্রোলচালিত মোটর গাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ—এরাই বাতাসকে প্রধানত দূষিত করে। ধুলো-ধোঁয়া ভরা বাতাস নিঃশ্বাসে নিই, ফুসফুসের নানান অসুখ হয়।

পেট্রোল ও ডিজেলের ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এর মধ্যে সূক্ষ্ম কার্বন কণা এবং নানারকমের হাইড্রোকার্বন থাকে। পেট্রোলের ধোঁয়ায় সীসা থাকে। সীসা মানবদেহের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। নানারকম স্নায়বিক রোগের উৎস এই সীসা। কলকারখানা অঞ্চলের বাতাসে অনেক ক্ষতিকর উপাদান পাওয়া যায়। বিভিন্ন জ্বালানীর দহনের জন্য বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড আসে। ক্লোরিন আসে কাপড় কাগজের কারখানা থেকে। বিষাক্ত কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস ডিজেল ও পেট্রোলচালিত যানবাহনের ধোঁয়া থেকে আসে। যানবাহন ও কাঁচা কয়লার ধোঁয়া থেকে আসে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি। অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড আসে যথাক্রমে সার ও শোধনাগার থেকে।

বায়ুদূষণের জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ ভূপাল শহরের ঘটনা। ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে হঠাৎ মিথাইল আইসোসায়ানেট (মিক) গ্যাস বেরিয়ে এসে দু'হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। বড় বড় শহরগুলিতে ক্যান্সার বাড়ছে, বাড়ছে ফুসফুসের অসুখ—এর জন্য ক্রমবর্ধমান দূষণ দায়ী।

আবহাওয়াকে শুধু তো বাতাস নিয়ন্ত্রণ করে না, সঙ্গে থাকে জল। গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের জলের প্রয়োজন ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। চাষবাস, কলকারখানা এবং খাবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কোটি কোটি গ্যালন জল। পৃথিবীর মূল জলাধার সমুদ্রে এখনো তেমনভাবে হাত পড়েনি। পৃথিবীর মিষ্টি জলে টান পড়েছে, নদী ঝিল বিল হ্রদে আর কাজ হচ্ছে না, মাটির নীচের সঞ্চিত জলে আজ হাত পড়েছে। ভূগর্ভস্থ জল লক্ষ লক্ষ বছর

জমা পড়ে আছে, আজ আমরা বেহিসাবী হয়ে তা খরচ করছি। গভীর নলকূপের সাহায্যে রোজ টেনে আনছি হাজার হাজার গ্যালন জল।

পাতাল জল সম্পর্কে একটা কথা প্রায়ই বলা হয় যে, এই জল দূষণমুক্ত। কিন্তু কথাটা আংশিক সত্য। বিশেষত যে জল মাটির খুব নিচে থাকে না, তাকে দূষণমুক্ত বলা যায় না। শহর অঞ্চল, বস্তি, কারখানা, মানুষের বাসভূমি ইত্যাদি যত প্রসারিত হচ্ছে ততই পরিবেশ দূষিত হয়ে চলেছে। বর্ষা কালে যখন মাটির নিচের জলতল অনেক উপরে উঠে আসে তখন সাধারণ কুয়া বা নলকূপের জল রোগ-বীজাণু মুক্ত হয় না। তাছাড়া বিবেচনা না করে পাতাল জলের ব্যবহারে অনেক বিপদ আছে। প্রথমত, এতে ভূস্তর নিচের দিকে নামার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত, মাটির দুটি স্তরের মাঝখানের জল কমে গেলে কাছাকাছি নদী বা সাগরের জল মাটির মধ্য দিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ে এবং জলকে দূষিত ও লবণাক্ত করে। মাটির নিচ থেকে অত্যাধিক জল টেনে তোলায় মেক্সিকো, টোকিও, হিউস্টন প্রভৃতি শহরে বেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। তাছাড়া, সামগ্রিকভাবে জলস্তর নেমে গেলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে, জল তোলার খরচ বাড়ে, মাটির আর্দ্রতা নষ্ট হয়—যা পরে ব্যাপকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। ক্রমে ভূমিক্ষয় হয়, বনভূমির ক্ষতি হয়, বৃষ্টিপাতের তারতম্য হয়। উন্নত দেশে ভরা বর্ষার সময় মাটির গভীরে গর্ত খুঁড়ে কিছু জল আবার চালান করা হয়; দুঃখের ব্যাপার, আমাদের দেশে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই।

ভারতে বছরে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০০০ ঘন কিলোমিটার। এর প্রায় সাড়ে বারো শতাংশ মাটির নিচের জল সরবরাহে অংশ নেয়, যার পরিমাণ বছরে প্রায় ৫০০ ঘন কি. মি.। এছাড়া নদী, জলাশয় ও বন্যার জল মাটির নিচে চুঁইয়ে ভূগর্ভে জল সরবরাহ করে যায়, যার পরিমাণ প্রায় ১৫০ ঘন কি. মি.।

এদেশে মাটির নিচ থেকে খনিজ পদার্থ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি তোলার ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু মাটির নিচের জল ব্যবহারে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাতে পরিবেশের যা ক্ষতি হচ্ছে তার হিসাব নেই। এমনকি সরকারী পরিকল্পনায় অনেক সময় ভূগর্ভস্থ জলের ভুল বণ্টন ব্যবস্থার ফলে এ ধরনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উত্তরপ্রদেশ। কৃষিকাজে ওই জলের মাত্রাধিক ব্যবহারের ফলে সেখানকার বহু জায়গায়

ভূগর্ভস্থ জলের তল অনেক উপরে উঠে এসেছে। সেসব অঞ্চল) জলাভূমিতে রূপান্তরিত।

ব্যাপক শিল্পায়ন, নগর প্রসারণ ইত্যাদির জন্য ঐ সব এলাকায় গড় উষ্ণতা বেড়েছে। কংক্রিটের বাড়ি, অ্যাসফাল্টের রাস্তা সারাদিনে যত তাপ শোষণ করে, সারারাত ধরে তা ছাড়তে পারে না। কিছুটা বাড়তি উত্তাপ থেকে যাওয়ায় পরিবেশের উত্তাপ ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। ধুলো ও উত্তাপ বাড়ার জন্য শহরগুলিতে ভ্যাপসা গরম বাড়ে, বৃষ্টিপাত বাড়ে। এমনিতে নগরে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো থাকে না—তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শহর অঞ্চলের এই নিজস্ব আবহাওয়াকে আজকাল বিজ্ঞানীরা 'মাইক্রোক্লাইমেট' বলছেন।

মানুষের কর্মকাণ্ড প্রসারিত হওয়ায় বনভূমি নষ্ট হচ্ছে। অরণ্য মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখে, বৃক্ষের পত্র কাণ্ড শাখায় জল ধরা থাকে। অরণ্যভূমি অধিক পরিমাণে সূর্যের তাপ ও আলো শোষণ করে। অধিক উত্তাপ অবশ্যই বাষ্পায়নে সাহায্য করে এবং বাতাসের আদ্র'তা বৃদ্ধি শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কারণ হয়।

ব্যাপকভাবে বনভূমিকে চাষের জমিতে পরিবর্তন করলে, ন্যাড়া জমি সূর্যের আলোর বেশির ভাগ প্রতিফলিত করে, শোষণের মাত্রা কমে। তার জন্য জল কম করে বাষ্পায়িত হয়—বৃষ্টির পরিমাণ কমে যায়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, নিয়ন্ত্রিতহারে যদি বৃক্ষচ্ছেদ করা হয় তবে বৃষ্টিপাতের তেমন কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু ব্যাপকহারে অরণ্যনিধন চললে বৃষ্টিপাত কমে, বৃষ্টি কমলে নতুন করে গাছপালা জন্মাতে পারে না। মরুসদৃশ আবহাওয়া ক্রমশ ওই সব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। বনভূমি অপসারিত করলে ভূমিক্ষয় অবধারিত। ভূমিক্ষয়ের জন্য নদীখাত বন্ধ হয়ে আসে, চাষের জমির ক্ষতি হয়। বন সাধারণভাবে বৃষ্টির জলকে বিন্যস্ত করে দেয়। প্রথমে গাছের পাতা বৃষ্টির ধারাকে ধরে, ধরে বড় বড় ফোঁটাগুলিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। তাতে জলকণা ভালোভাবে মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। মাটির উপর দিয়ে কম পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় এবং ভূমিক্ষয় হ্রাস পায়। অর্থাৎ বৃষ্টির সুফল পুরোপুরি পেতে হলে বনভূমির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে।

নগর পরিকল্পনার ত্রুটির জন্য বায়ুর স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পাহাড়ের ঢালে, উপত্যকায়, সমুদ্রতীরে গড়ে ওঠা শহরের বড় বড় বাড়িগুলি বায়ুপ্রবাহকে বাধা দেয়। ফলে শহরের কোন কোন অঞ্চল অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে, কোন অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়, কোন অঞ্চলে কম। ইদানীং উন্নত দেশগুলিতে নগর পরিকল্পনা করার সময় আবহাওয়াবিদদের ডাক পড়ে, তাদের পরামর্শ নেওয়া হয়।

বিমান বন্দরের রান-ওয়ে পাতার সময় বায়ুর গতিবেগের কথা মনে রাখতে হয়। স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ অভিমুখী করে যদি রান-ওয়ে পাতা হয় তো সব থেকে ভালো, বিমানগুলি বায়ুপ্রবাহের সদ্ব্যবহার করতে পারে। মানুষের হস্তক্ষেপে যদি বায়ুপ্রবাহের গতিমুখ বদলে যায় তো নানা ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়।

বৌদ্ধিক পরিবেশ

অর্ধশতাব্দী পূর্বে বার্টাণ্ড রাসেল জে. বি. এস. হলডেনকে একটি পত্রে লিখেছিলেন—"গ্রীকপুরাণে বর্ণিত ডিডেলাস পুত্র আইকেরাসকে আকাশে উড়তে শিখিয়ে তার সর্বনাশের কারণ হয়েছিলেন। কারণ, দুরন্ত আকাশ অভিযানে আইকেরাস শেষে প্রাণ হারিয়েছিল। আমার মনে হয়, আধুনিক বিজ্ঞান মানবজাতিকে উচ্চাশার অভিযানে টেনে এনে তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।"

রাসেলের সঙ্গে আজ বোধহয় অনেকে একমত হবেন। আবহাওয়ার অস্থিরতা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি একযোগে বিজ্ঞানের দিকে আঙুল তুলে তাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সমস্যার তীব্রতা এত বেশি যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমন কি বহু বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী অসহায় বোধ করছেন।

সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা হবে একটি ছোট্ট উদাহরণে। প্রতি বছর ছয়শ' কোটি টন অতিরিক্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে জড়ো হচ্ছে। কার্বন-ডাইঅক্সাইড অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে, তাই অধিক কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অর্থ উষ্ণতা বৃদ্ধি। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে ১৮৫০ সালের পর থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড শতকরা দশভাগ বেড়েছে। এই শতকের শেষে এই গ্যাসের পরিমাণ আরো শতকরা বিশভাগ বাড়তে

পারে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দেড়শ' বছরের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতা এতটা বেড়ে যাবে যে আণ্টার্কটিকা, গ্রীণল্যাণ্ডের বরফ গলে গিয়ে পৃথিবী জুড়ে সেই বাইবেল বর্ণিত মহাপ্লাবন সমুদ্রতীরবর্তী দেশের অনেকটা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যে হারে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য, পানীয় জল, বাসস্থান এবং জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রে অকুলান হবে। বর্তমানে আমাদের হাতে আর পঞ্চাশ বছরের মতো জালানী আছে। তারপর ? তারপরের শক্তিসংকট সভ্যতাকে টেনে নামিয়ে আনবে সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে।

অবস্থা ভয়াবহ। কিন্তু ভয়াবহ বলে থেমে থাকলে চলবে না। এক-দিকে যেমন চাই আরো খাদ্য বাসস্থান, চাই শক্তি, অন্যদিকে চাই পরিচ্ছন্ন নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ। বিজ্ঞানের সাহায্যে এ সব সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে আমাদের নতুন এক সংকটের মুখোমুখি পড়তে হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে, যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিবেশ দূষণ সমস্যার জন্য দায়ী তা কিভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করবে ? বিজ্ঞান প্রযুক্তি কি সমস্যা বাড়াবে না ?

একটা কথা প্রথমে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন—মানব সভ্যতার গোড়া-পত্তন হয়েছে পরিবেশ দূষণের মধ্য দিয়ে। যেদিন মানুষ প্রথম আগুন জালাতে শিখল সেদিনই কি পরিবেশ দূষিত হয়নি ? সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পরিবেশ দূষণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিবেশকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে গেলে মানবজাতিকে প্রাগৈতিহাসিক বন্যস্তরে ফিরে যেতে হয়। তা যখন সম্ভব নয় তখন প্রশ্নটা কেবলমাত্র পরিবেশ দূষণ নিয়ে নয়, প্রশ্ন হল—পরিবেশকে আমরা কতটা দূষিত হতে দেব, দূষণের মাত্রা কোন্ পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলবো—ব্যাস আর নয়, এখানেই শেষ। সেই দূষণের মাত্রা কি ঠিক হয়েছে ? বর্তমানে জল, বায়ু, মাটি, তথা পরিবেশের যা অবস্থা তাতে বিজ্ঞানীদের অভিমত যে পরিবেশ দূষণ আর বাড়ানো উচিত নয়, বাড়ালে মানুষের বায়োলজিক্যাল অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। এদিকে আবার মানুষের প্রয়োজনে বিজ্ঞান প্রযুক্তির আরো বিকাশ প্রয়োজন। প্রশ্ন হল, অগ্রসরমান সভ্যতার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক কি হবে ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাবার আগে আমাদের জানতে হবে—মানুষের সভ্যতার লক্ষ্য কি ? সে কি আরো খাদ্য, আরো পানীয়, আরো শক্তি ইত্যাদির

উৎপাদন মাত্র? তা কখনই হতে পারে না। কেবলমাত্র উৎপাদনমুখী সভ্যতা কোন্ অন্তঃসারশূন্যতায় পর্যবসিত হয় তা পশ্চিমের দেশগুলির দিকে তাকালে বুঝতে পারি। আজ বিজ্ঞানীমহল বলছেন যে ভবিষ্যৎ মানুষকে একটি সর্বাঙ্গীণ সুস্থ সমাজ গঠনের সংগ্রামের পাশাপাশি মানুষের বিবর্তনকে সঠিক পথে চালনা করতে হবে। যেমন মানব সমাজের বিকশিত হবার সম্ভাবনা আছে, তেমনি সম্ভাবনা আছে লৌকিক মানুষের বিবর্তনের। পারিপার্শ্বিক জীবমণ্ডলকে বিষাক্ত করে দিয়ে মানুষ কখনই তার বিবর্তনের শেষ ধাপে পৌছাতে পারবে না।

তাই আগামী দিনে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়তে হবে সচেতন চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে। সঠিক পরিকল্পনার সাহায্যে মানুষ তার কর্মকাণ্ডর এমনভাবে প্রসারণ করবে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার সহ-অবস্থান এবং সহযোগিতা প্রাধান্য পায়। বর্তমান জীবমণ্ডলের স্থানে দেখা দেবে এক বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল, যাকে অনেক বিজ্ঞানী noosphere বলছেন।

মানুষের পরিকল্পনা মাফিক চিন্তা ভাবনা কিভাবে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল—আধুনিক নগর পরিকল্পনা। আমাদের কলকাতা শহর পরিকল্পনাবিহীন পথে গত তিনশ’ বছর ধরে গড়ে উঠেছে—আস্তে আস্তে শহরের সমস্যা বেড়েছে। সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য আমরা গড়ে তুলেছি পরিকল্পনা মাফিক লবণ হ্রদ উপনগরী। নতুন উপনগরীতে পুরানো শহরের অনেক সমস্যা নেই। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা-প্রসূত কর্মধারা তার সমস্যা লাঘব করতে সাহায্য করেছে।

শুধু নগর পরিকল্পনা নয়—সমস্ত অর্থনীতি ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী হলে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা সম্ভব। একদা, ধনবাদী সভ্যতার বিকাশের আদি পর্বে, শিল্পপতিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায়, তাদের সুবিধামতো কলকারখানা গড়েছিল। সেই শিল্পায়নের পিছনে মুনাফার তাগিদ ছিল বেশি, শিল্পের সামাজিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছিল। আধুনিক যুগে শিল্পায়নের প্রশ্নে সরকারী ভূমিকা অনেকখানি। সমাজতান্ত্রিক দেশে তো বটেই, এমনকি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন থাকে না। পরিবেশ দূষণ, বায়ু দূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ রোধ করতে প্রায় সব সরকার নানারকমের আইন, বিধি, নিয়ন্ত্রণ চালু করেছে।

আমাদের দেশে এ ধরনের অনেক আইন আছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলি পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নে আগের থেকে বেশি মনোযোগী হয়েছেন। তবে সমস্যাটি এত জটীল এবং সামাজিক প্রশ্নগুলি এতে জড়িত আছে বলে কেবলমাত্র আইন করে বেশি কিছু করা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল, পরিকল্পনা করে আমরা কি আবহাওয়া বদল করতে পারি না? আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়েন একশ' বছর আগে একবার বলে-ছিলেন—"আবহাওয়া নিয়ে সবাইতো গালগল্পই করে, কিন্তু এই বিষয়ে কই কেউ তো কিছু করে না।" অর্থাৎ তিনি জানতে চাইছেন—আবহাওয়া বদলাবার উদ্যোগ কোথায়? মার্ক টোয়েনের সময় আবহাওয়াকে পাল্টে দেবার কথা ভাবা যেত না। এখন যে যায়, তা নয়। তবে কিছু কিছু চেষ্টা হচ্ছে—এই মাত্র।

আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে, আমরা প্রথমে অসহ্য আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ এক কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা করি। গ্রীষ্মের দুপুরে ফ্যান চালিয়ে, এয়ার কুলার বসিয়ে বা শীতের দেশে সেণ্ট্রাল হিটিং-এর ব্যবস্থা করে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত হই। শুধু বাড়ি কেন, অফিসগৃহ, জাহাজ, বিমান, মোটরগাড়ি সবই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এই যে কৃত্রিম পরিবেশ, তার আবিষ্কার হয়েছিল গুহায় আশ্রয়ের মধ্য দিয়ে, তারপর এলো বাড়ি, অট্টালিকা। রোদ জল ঝড়-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বাড়ির আয়োজন। বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দেখছেন, একদিন দূর গ্রহ উপগ্রহে কৃত্রিম আবহাওয়া বানিয়ে তার মধ্যে মানুষ উপনিবেশ গড়ে তুলবে। আগামী দিনে কলকারখানা মাটির নিচে বসানো হবে, তাদের চালাবে যন্ত্রদানব, মাটির উপরে থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। মানুষের নতুন বাসস্থান হবে সমুদ্রের তলদেশে, মাটির নিচে, মরুভূমিতে, তুষারপূর্ণ মেরুঅঞ্চলে। পরিবেশ দূষিত করতে পারে এমন সব কলকারখানা বসানো হবে মহাশূন্যে ভাসমান উপগ্রহে।

মানুষ বহুদিন ধরে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। যখন বিজ্ঞান উন্নত হয়নি, তখন অনাবৃষ্টির সময় মানুষ পুজো থেকে শুরু করে ধোঁয়া দিয়ে বৃষ্টি নামানোর চেষ্টা করেছে। আসলে মেঘের জলকণাগুলি জমিয়ে বড়ো করে তোলাটাই সমস্যা। জলকণাগুলি জমতে হলে কোন

কিছুকে আশ্রয় করে বড় হওয়া দরকার। ফরাসী যন্ত্রকুশলী কুলিয়ায় ১৮৭৫ সালে একটি পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন কিভাবে বৃষ্টির জলের মধ্যে ধুলো-কণার কেন্দ্র আছে। মেঘের মধ্যে কোন কোন লবণের গুঁড়ো ছড়িয়ে কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি নামানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৬ সালে বার্নাড ভন্নেগুট নামে এক বিজ্ঞানী এরোপ্লেনে চড়ে মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডাইডের গুঁড়ো ছড়িয়ে বৃষ্টি নামিয়েছিলেন। বরফের কেলাসের আকার দু'মুখো, আবার সিলভার আয়োডাইডের কেলাসও দু'মুখো। কাজেই মেঘের জলকণা জমিয়ে বরফকণা সৃষ্টি করার ক্ষমতা সিলভার আয়োডাইডের আছে। সিলভার আয়োডাইডের বদলে আরো দু'মুখো কেলাস, যেমন লেড আয়োডাইড, ভ্যানাডিয়াম পেণ্টোক্সাইড, কিউপ্রিক সালফাইড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতা এলেও অনাবৃষ্টির সমস্যাকে এভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি।

ইদানীংকালে কৃত্রিম উপায়ে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি কমিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। ঘূর্ণিঝড়ের দোলায় সাগর যখন উত্তাল তখন রাসায়নিক তরল পদার্থকে জলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, সেই তরল পদার্থ জলের পৃষ্ঠটান কমিয়ে দিয়ে ঢেউ-এর প্রাবল্যকে স্তিমিত করে এবং জলের উপর ভাসমান তরল পদার্থ জলের বাষ্পায়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাষ্পায়ন না হতে পারলে সব থেকে সুবিধা, কারণ জলীয় বাষ্পের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে ঘূর্ণিঝড়ের বেগ ও ক্ষমতা দুই হ্রাস পায়। জাহাজ বা এরোপ্লেন থেকে এভাবে রাসায়নিক তরল পদার্থ ছড়িয়ে আমেরিকান আবহাওয়াবিদরা হারিকেনের তীব্রতাকে অন্তত শতকরা পঞ্চাশভাগ কমিয়েছেন।

আবহাওয়ার যতগুলি ক্ষতিকর দিক আছে তাদের মধ্যে শিলাবৃষ্টি অন্যতম। ফসলের ক্ষতি করতে এদের জুড়ি নেই। শিলাবৃষ্টি কমাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আজকাল। রকেট ও গ্রেনেডের সাহায্যে শীতল ঝোড়ো মেঘের ভিতর ছুঁড়ে দেওয়া হয় সিলভার আয়োডাইড ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ। র‍্যাডারের সাহায্যে প্রথমে বুঝে নেওয়া হয়—কোন্ মেঘ থেকে শিলাবৃষ্টি হতে পারে, তারপর গ্রেনেড ছুঁড়ে তাকে ধ্বংস করা হয়। বজ্রমেঘ থেকে বজ্রপাত ঠেকাবার জন্য বিজ্ঞানীরা মেঘের মধ্যে ধাতব সূঁচের পুঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন, এতে মেঘের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট বিদ্যুৎক্ষরণ

ঘটে, বজ্রপাতের সম্ভাবনা কমে যায়। এর আগে হাউইবাজি ছুঁড়ে শিলা-বৃষ্টি বন্ধের চেষ্টা হয়েছে।

শীতকালের কুয়াশা সব সময় বড় সমস্যা সৃষ্টি করে। বিমান বন্দর, রাস্তা-ঘাট, নদীপথ কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায়, দুর্ঘটনা ঘটে। শুকনো কার্বন-ডাই-অক্সাইডের গুঁড়ো, সিলভার আয়োডাইডের গুঁড়ো ছড়িয়ে কুয়াশা দূর করা সম্ভব হচ্ছে। কুয়াশা থেকে জল ঝড়ে গিয়ে বাতাস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

হাওয়ার বেগকে কমিয়ে দেবার জন্য গাছের বেড়া তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষত সমুদ্রতীরের হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা সারি সারি ঝাউ লাগাচ্ছি। সামুদ্রিক ঝড়কে প্রশমিত করার কাজে এদের কিছু অবদান আছে। বৃক্ষ রোপন করে হাওয়ার বাধা তৈরি হয়েছে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে। বসন্তকালে এ সব এলাকার উপর দিয়ে প্রবল শুকনো দক্ষিণ-পূর্ব বাতাস বয়ে গিয়ে মাটির উপরকার উর্বর স্তর উড়ে যেত—তা ঠেকিয়েছে এই বনাঞ্চল। অগ্রসরমান মরুবালুকে প্রতিহত করার জন্য আমরা বনসৃজন করি।

মেরুঅঞ্চলের কাছাকাছি দেশগুলিতে প্রায় বারো মাসই শীত, বরফে আচ্ছন্ন মাটি, চাষবাস হয় না। সূর্যের আলোর বেশি ভাগ প্রতিফলিত করে বরফ, তাই গরম হয়ে যে বরফ গলবে, তারও উপায় নাই। আজকাল কয়লার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে আলোর প্রতিফলন কমানো হচ্ছে, উত্তাপ বাড়ছে, বরফ গলছে, জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা হচ্ছে।

মোটকথা, আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করা এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কিছু ব্যবস্থা নিলেও এখনও আবহাওয়া প্রকৃতির অধীন, আমরা কেবলমাত্র তাকে অনুসরণ করতে পারি। অনুধাবন করতে পারি, কিন্তু তেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে পরিণতির কথা আসে।

যুগ যুগ ধরে নানান শক্তি ও বস্তুর ভারসাম্যে আবহাওয়া গড়ে উঠেছে। আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার আগে ঐ বিষয়গুলি ভালো করে বোঝা প্রয়োজন। নাহলে হিতে বিপরীত হবে। মানুষের কল্যাণ করতে গিয়ে তার ক্ষতি হতে পারে। আবহাওয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তার নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্ত হতে হবে।

যে পৃথিবী মানুষ গড়ে তুলতে চলেছে, তাতে তার কর্মকাণ্ড থেমে থাকার

প্রশ্ন নেই। বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের প্রযুক্তি জন্ম নেবে পরিবেশের প্রশ্ন মাথায় রেখে। মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বদল হয়ে গেছে। আগে পরিবেশ মানুষের উপর প্রভুত্ব করত, বন্যা খরা ভূমিকম্প ব্যাধির হাতে মানুষ পুতুলের মতো নাচতো। তারপর অবস্থাটা বদলালো। কালে কালে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ তার অনিশ্চয়তাকে অনেকটা দূর করলো, আজ যেন মানুষই প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করছে। কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক তো প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক নয়। আজ সেই সময় এসেছে যখন প্রকৃতির নিয়মগুলি বুঝে নিয়ে, সহ-অবস্থানের নীতিতে শ্রদ্ধা রেখে এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিত্রতামূলক দ্বন্দের মধ্য দিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। ঐ বৌদ্ধিক পরিবেশের মধ্যে মানুষের একমাত্র মুক্তি, অন্য কোন পথ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও তার প্রতিশেধ/সুখময় ভট্টাচার্য/৫·০০
২। পেশাগত ব্যাধি/শ্রীকুমার রায়/৭.০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত/প্রদীপকুমার মজুমদার/৭·০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস/অমিতাভ রায়/৭·০০
৫। মানুষের মন/অরুণকুমার রায়চৌধুরী/৪·০০
৬। বয়ঃসন্ধি/বাসুদেব দত্ত চৌধুরী/৯·০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি/সঙ্কর্ষণ রায়/৮·০০
৮। হাঁপানি রোগ/মনীশচন্দ্র প্রধান/৪·০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়/৮·০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার/ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ/৬·০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি/দুর্গা বসু/১০·০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ/কানাইলাল মুখোপাধ্যায়/১০·০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ/ডঃসমীরকুমার ঘোষ/৭·০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহীততত্ত্ব/প্রদীপকুমার মজুমদার/১০·০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা/দিলীপকুমার চক্রবর্তী/৭·০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা/মনোজরঞ্জন ঘোষ
১৭। সয়াবীন/দ্বিজেন গুহবকসী/৯·০০
১৮। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান/শ্যামল বণিক
১৯। পাতালের ঐশ্বর্য/সঙ্কর্ষণ রায়/১০·০০
২০। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র/সুশীল ঘোষ/১২·০০
২১। ঘরে করো শিল্প গড়ো/তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়/১১·০০
২২। আমাদের জীবনে পাখী/সুধীন সেনগুপ্ত/১৪·০০
২৩। জিওল মাছ/শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়/১২·০০
২৪। সমুদ্র পরিচয়/প্রসাদ সেনগুপ্ত/৮·০০
২৫। ক্যাকটাস ও ফুলচাষ/বলাইলাল জানা

দশ টাকা

বিদ্যুতের রূপকথা

—অজয় চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার আজ সহজ এবং স্বাভাবিক। আজকের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বিস্তার এবং প্রভাব। আধুনিক সভ্যতার অভাবিত উন্নতির মূলেও রয়েছে বিদ্যুতের বিচিত্র অবদান। কিন্তু এই শক্তিটির সন্ধান খুব সহজে পায় নি মানুষ। দীর্ঘকাল ধরে এর অনুসন্ধান, তিলে তিলে এর প্রকৃতি অনুধাবন, ক্রমে ক্রমে একে মানুষের নানা কাজে লাগাবার ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি অভাবিত। তা অবাস্তব রূপকথাকেও বোধ হয় হার মানায়। বিদ্যুৎ আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা অনবদ্য কাহিনীর আকারে লিখেছেন লেখক। বইটি পড়তে শুরু করে শেষ না করে ওঠার উপায় থাকে না লেখার মুন্সীয়ানায়। একাধারে এ হল বিদ্যুতের সম্পূর্ণ ইতিহাস, আবার তার পেছনে যে সব মানুষের সাধনা জড়িয়ে রয়েছে তাদের জীবন-কাহিনী এবং সাধারণ পাঠক ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু সবটাই এমন উপভোগ্যভাবে পরিবেশিত যে মনেই হবে না সত্য ঘটনা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জটিল তথ্য বা তত্ত্ব। রূপকথার আমেজে এ এক অপরূপ বাস্তবের কথা।